Vol. 44 | No. 2 | 2001

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

ফেরারী ফৌজ ও রাইফেল : অগ্নিমন্ত্রের দীক্ষায় জেগে ওঠা সশস্ত্র গণদেবতা

Volume	44
Issue	2
Year	2001
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	আমীনুর রহমান
Published online	February 1, 2001
DOI	10.62328/sp.v44i2.2
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v44i2.2
Pages	২৫-৫০
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

ফেরারী ফৌজ ও রাইফেল : অগ্নিমন্ত্রের দীক্ষায় জেগে ওঠা সশস্ত্র গণদেবতা

আমীনুর রহমান*

১

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা মঞ্চনাটক ছিল প্রধানত সখের বিষয়, অবসরের আমোদ—শ্রম ও স্বেদ-সম্পর্কহীন ধনিক শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতায় উদ্ভূত, প্রতিপালিত ও বর্ধিত; কিন্তু শতাব্দীর শেষপ্রান্তে তা 'থিয়েটার' নাম ধারণ করে পেশাদারি ও ব্যবসায়িক চারিত্র্য অর্জন করে।[১] ব্যবসায়ীদের করায়ত্ত ঐ-নাট্যপরিমণ্ডলে নিঃশেষিত হয়েছে গিরিশচন্দ্র ঘোষের (১৮৪৪-১৯১১) সমগ্র নাট্যপ্রতিভা;[২] থিয়েটার-কারবারিদের প্রাকৃতরুচি এবং অর্বাচীন দর্শকদের দাবির কাছে নিজেদের প্রতিভার অকাল মৃত্যু প্রত্যক্ষ করে বেদনাতুর হয়েছেন অমৃতলাল বসু (১৮৫৩-১৯২৯), ক্ষিরোদপ্রসাদ (১৮৬৩-১৯২৭), অতুলকৃষ্ণ প্রমুখ সম্ভাবনাময় নাট্যকার-অভিনেতা। সাধারণ রঙ্গমঞ্চে তখন দর্শক সমাগমের কোন কমতি ছিল না এবং ব্যবসায়িক দিক দিয়ে থিয়েটার ব্যবসা লাভজনক বলেই বিবেচিত হতো। বলা বাহুল্য, ঐ-সময়ে 'থিয়েটার'-এর প্রধান দর্শক ছিল সামন্ততন্ত্রের উচ্ছিষ্টভোগী অবক্ষয়িত, রুচিবর্জিত খেউর আর আখড়াইয়ের সমঝদার 'বাবু সমাজ'[৩]। সাধারণ রঙ্গমঞ্চের সমকালীন দুর্দশা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ সচেতন ছিলেন এবং সেখানে 'আশাপ্রদ' কোন সুস্থতা তিনি প্রত্যাশা করেননি; কারণ, 'রসবোধ ও কলাজ্ঞান আছে' এমন লোকের প্রাণ সেখানে 'কিছুতেই তিষ্ঠুতে পারবে না'। প্রচলিত রঙ্গমঞ্চের প্রতি তিনি এতটাই বীতশ্রদ্ধ ছিলেন যে রুচিশীল নাটক মঞ্চায়নের জন্য তিনি একটি স্বতন্ত্র রঙ্গমঞ্চের প্রস্তাব করেন যা হবে 'যাঁরা ললিতকলার সূক্ষ্ম সৌন্দর্য উপভোগ করতে চান—তাঁদের জন্যে'[৪]। এর আগেই, বিশ শতকের শুরুতে (পৌষ ১৩০৯) সাধারণ রঙ্গমঞ্চের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করে 'রঙ্গমঞ্চ' প্রবন্ধে তিনি দেখিয়েছিলেন 'লক্ষ্মীর পেঁচা' 'সরস্বতী পদ্ম' আচ্ছন্ন করে কীভাবে আধুনিক থিয়েটারকে 'ভারাক্রান্ত একটা স্ফীত পদার্থে' পরিণত করেছে।[৫] ফলে পুঁজিলগ্নিকারীদের বৈষয়িকবুদ্ধি, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, সুরুচি-বিকৃতি, সম্ভাবনা ও সংকটের সকল প্রভাব ও প্রতিপত্তি আত্মস্থ করে কেটেছে বাংলা নাটকের প্রথম পঞ্চাশ বছর।

---

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম পঁচিশ বছরে বাংলা উপন্যাস, ছোটগল্প, কবিতা, প্রবন্ধ যখন তার শৈশব-কৈশোরের দুর্বলতাকে জয় করে পূর্ণযৌবনের দৃঢ়তায় স্থিত, বিস্ময়করভাবে, তখনও বাংলা নাটক ব্যবসাদারের ঘেরাটোপের মধ্যেই আবর্তিত। বঙ্গভঙ্গরদ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাংলা নাটকে যে কিঞ্চিৎ পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছিল গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১২) ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের (১৮৬৩-১৯১৩) মৃত্যু এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিনাশ তাকেও স্তিমিত করে দিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পেশাদার রঙ্গমঞ্চে শিশির ভাদুড়ির আবির্ভাব; তাঁর নির্দেশনায়, সুরুচিসম্পন্নতায়, প্রয়োগনৈপুণ্যে এবং ব্যক্তি-অভিনয়ের উৎকর্ষে বাংলা নাটকে যে পরিবর্তন ও রুচির ছোঁয়া লাগল তাকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সাধুবাদ জানালেন। কিন্তু বাংলা নাটকের ঐ প্রবাদপ্রতিম পুরুষদের প্রচেষ্টা এবং প্রতিভা নাটকের যে রূপ ও প্রকৃতি তৈরি করে দিল সেখানে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী এবং বুর্জোয়া, পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণী মানসিকতাই পরিপোষিত হলো। বৃহত্তর জনগণ অর্থাৎ শ্রমিক, কৃষক, সাধারণ মানুষের জীবন, তাদের দুর্গতি, সামাজিক অনাচার ও অসংগতিকে সমকালের দর্পণে মুকুরিত করে তোলার মতো বিশ শতকের প্রথম চল্লিশ বছরে কোন 'দীনবন্ধু'র আবির্ভাব ঘটল না (মন্মথ রায় ও তুলসী লাহিড়ী ব্যতিক্রম); হয়তো ঘটা সম্ভবও ছিল না। কারণ অবরুদ্ধ সামাজিক, ঔপনিবেশিক শ্রেণীবিন্যাস মানুষের সৃষ্টিশীল কর্মে কখনও কোন সদর্থকতা বয়ে আনে না। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন, সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রলেতারিয়েতদের নিরংকুশ বিজয়, বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদের পরাজয় এবং জাতীয়তাবাদের বিকাশ ভারতীয় উপমহাদেশে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তার মধ্য দিয়েই বাঙালির সৃষ্টিশীল কর্মযজ্ঞ নতুনভাবে স্পন্দিত হতে শুরু করেছিল। ফলে জীবনকে দেখার উনিশ শতকীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও বোধ, সম্পূর্ণভাবে না হলেও, সন্দেহাতীতভাবে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছিল জীবনচেতনার গভীরতম স্তর থেকে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পূর্ব ও পরবর্তী কলকাতাকেন্দ্রিক বাংলা নাটকের আত্মপ্রকাশ বহুকৌণিক সমাজ ও আর্থনীতিক জটিলতা, বিচিত্র মানসিক প্রবণতা ও বহুমাত্রিক সৃষ্টিশীল সম্ভাবনায় বিজড়িত হয়ে। ঐসব নাটকের সৃজন-মঞ্চায়নের সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্পর্কে সূত্রবদ্ধ হয়ে আছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া, ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির শাসন-শোষণের নগ্নতা, ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা (১৯২৫), মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা (১৯২৯), জেল হত্যা (হিজলি জেল, ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৩১), আর্থনীতিক মন্দা, বেকারত্ব-হতাশা, বিশ্বব্যাপী ফ্যাসিস্ট শক্তির অভ্যুত্থান, জাতীয়তাবাদী ও বিপ্লবী আন্দোলন, মানিকতলার বোমা ষড়যন্ত্র, রাইটার্সের অলিন্দযুদ্ধ, চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, পঞ্চাশের মন্বন্তর (১৩৫০), দেশবিভাগ ও উদ্বাস্তু জীবনের যন্ত্রণা প্রভৃতি ঘটনা এবং সেইসঙ্গে বারীন ঘোষ, যতীন মুখোপাধ্যায়, সূর্য সেন, প্রীতিলতা প্রমুখের বিপ্লবী কর্মকাণ্ড। এ-সকল সামাজিক-মানসিক বাস্তবতার উর্ণজাল 'বাঙালি জীবনে যেমন প্রবলভাবে প্রভাব ফেলল তেমনি বাংলা নাটকেও'।[৬] 'গিরিশ নাট্য পরিষদ,' 'বহুরূপী সম্প্রদায়', 'লিটল থিয়েটার গ্রুপ', 'রূপকার', 'শৌভনিক', 'নান্দীকার', 'বঙ্গীয় শেক্সপীয়র পরিষদ', 'ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ'—চল্লিশের দশকে যে

নতুন প্রচেষ্টা, প্রবণতা ও উৎসাহ নিয়ে বাংলা নাটকের মঞ্চায়ন শুরু করল তার সঙ্গে পূর্ববর্তী বাংলা নাটকের লক্ষণের চেয়ে বৈলক্ষণই প্রবল। নাটকের বিষয়বস্তু হিসেবে 'সমকাল' এদের চেতনায় ধরা দিল ভিন্নতর ব্যঞ্জনায়—কষ্টকল্পিত দূরবর্তী অজানা-অচেনা জীবনের আলোছায়ার রঙিন রূপকল্প নয়, প্রাত্যহিকতার ক্লেদ, জমে-ওঠা বিনষ্টি এবং সমাজ-রাজনীতি-অর্থনীতির দেশীয় ও আন্তর্দেশীয় শকুনি-আচরণ এ-সময়ের নাট্যকারদের করে তুলেছিল প্রথাবিরোধী, গণজীবনমূলসংলগ্ন, বাস্তবের নিখুঁত রূপকার। তীব্র সমাজ-সচেতনতা এবং সাধারণ মানুষের প্রতি এই অকৃত্রিম সহানুভূতি থেকেই বাংলা নাটকের বাঁক পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে। বিজন ভট্টচার্য (নবান্ন, ১৯৪৪), দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায় (অন্তরঙ্গ, তরঙ্গ, বাস্তুভিটা, মোকাবিলা প্রভৃতি), তুলসী লাহিড়ী (ছেঁড়া তার, উলুখাগড়া, পথিক), সলিল সেন (নতুন ইহুদি) প্রভৃতি নাট্যকারের রচনায় যে বাংলাদেশ, মূল্যবোধ, জীবনদৃষ্টি ও বাংলা নাটককে পাওয়া গেল তার সঙ্গে সহজে আর মেলানো গেল না পূর্ববর্তীকে। উৎপল দত্ত (১৯২৯-১৯৯৩) বাংলা নাটকের চল্লিশের এই পরিবর্তিত ধারার নাট্যকর্মীদের একজন এবং অগ্রসর ব্যক্তিত্ব।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী বাংলা নাটকের এই নতুন ধারা সম্পর্কে, সমকালে এবং এখনও অনেকেই সন্দিহান;—এর প্রধান কারণ, এই নতুন ধারার নাটকের প্রকৃতি ও প্রতীকী স্বরূপ সম্পর্কে দ্বিধা। তাঁদের মতে, আধুনিক নাটকে 'এমন কোন প্রথম শ্রেণীর নাট্যকার' নেই যাকে 'বর্তমান নাট্য-সাহিত্যের প্রতীকবিন্দু বলা যায়'; বর্তমান নাটকের জনপ্রিয়তার মূল কারণ 'অভিনয়ের কৃতিত্ব ও কৌশল' কিন্তু তা ভবিষ্যতে টিকে থাকবে না; 'সাম্প্রতিক সমস্যা সাম্প্রতিক নাটককে' নিয়ন্ত্রণ করছে, ফলে সাম্প্রতিক যখনই বিগত হয়ে যাবে তখন সেগুলো মূল্যহীন হয়ে পড়বে; এবং অভিনয়ে 'একক-অভিনয়ের রোশনাই সৃষ্টির অবকাশ কমে আসছে, যৌথ অভিনয়ের দিকে সকলের দৃষ্টি পড়ছে'।[৭] বস্তুত যে সকল বিষয়কে এখানে আধুনিক নাটকের দুর্বলতা বলে তাকে আক্রমণ করা হলো, সেগুলোই কিন্তু আধুনিক নাটকের বৈশিষ্ট্য ও শক্তি। আধুনিক নাটকের অভিনয় কুশলতাই তার প্রাণ এবং তার মূল উপজীব্য সাম্প্রতিক সমস্যা। কিন্তু সেগুলো কেবলই সাম্প্রতিকতাকে স্পর্শ করেই নিঃশেষিত হয় না, সমকালকে ধারণ করেই চিরকালীন হয়ে ওঠে। এ-কালের নাটক হচ্ছে একটি 'Collective Product'[৮] সুতরাং সেখানে এককভাবে কোন চরিত্রকে ভালো বা খারাপ বলার সুযোগ নেই এবং এই সামগ্রিক নাট্যচেতনার (Total theatre) মাধ্যমেই আধুনিক নাটক উনিশ শতককে পেছনে ফেলে এসেছে।

২

উৎপল দত্ত আধুনিক বাংলা নাটকের এক 'বিতর্কিত' ও 'বহুমুখী' প্রতিভা।[৯] 'বিতর্কিত', কারণ সমকালীন গড্ডলিকা প্রবাহের বিপ্রতীপে ছিল তাঁর ব্যক্তিক অবস্থান এবং প্রথাগত 'সামাজিক

বাস্তবতার' সঙ্গে আজীবন ছিল সম্পর্কের টানাপড়েন। এই দ্বিবিধ দ্বৈরথ তাঁকে একটি মূর্তিমান তর্কে পরিণত করেছিল। তাঁর কালের সর্বাধিক জনপ্রিয় নাট্যপরিমণ্ডল 'গ্রুপ থিয়েটার' ও মার্কসবাদী নাট্যসংগঠন 'গণনাট্য সংঘ' উভয়ের সঙ্গেই তিনি সচেতনভাবে সমদূরত্ব বজায় রেখেছেন, বা রাখতে বাধ্য হয়েছেন এবং নিজস্বতায় গড়ে তুলেছেন ভিন্নধারার নাট্যদল ও নিবেদিত নাট্যকর্মী। ফলে গ্রুপ থিয়েটার পন্থী এবং গণনাট্য সংঘের অনেকেই তাঁকে অমান্য-অবহেলা না করলেও প্রায় সকলেই সমালোচনামুখর ছিলেন ব্যক্তি ও নাট্যকার উৎপল দত্তের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে। আর 'বহুমুখী' এ-অর্থে, তিনি একদিকে 'তত্ত্ব ও আদর্শনিষ্ঠ' নাট্যকার; অন্যদিকে নাট্যনির্দেশক, অভিনেতা, প্রযোজক ও নাট্যসংগঠক। শুধু মঞ্চে নয়, যাত্রা, এজিটপ্রপ (পথনাটক) এবং চলচ্চিত্রেও ছিল তাঁর উজ্জ্বল উপস্থিতি। উৎপল দত্ত রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকেন নি কিংবা গ্রহণ করেন নি কোন দলের সদস্যপদ কিন্তু নাটক রচনা ও প্রযোজনার ক্ষেত্রে তিনি কোনদিনই রাজনীতি সচেতনাকে পরিহার করেন নি। তাঁর কালের, বা অব্যবহিত-পূর্ববর্তী অনেকেই হতে চেয়েছিলেন বহুক্ষেত্রে সার্থক ও সফলকাম মানুষ কিন্তু শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছেন (এদের মধ্যে শম্ভু মিত্রের নাম বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য, যিনি নাটকের ক্ষেত্র পরিহার করে চলচ্চিত্রাভিনেতা হতে গিয়ে সম্পূর্ণ ব্যর্থকাম হয়ে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন নাটকেই)। কিন্তু উৎপল দত্ত নাটক-চলচ্চিত্র-যাত্রা-পথনাটক সর্বক্ষেত্রেই নিজেকে যোগ্য এবং সার্থকনামা একজন অভিনেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এজন্য আজীবন, উৎপল দত্ত নিজেকে একজন অভিনেতা হিসেবে পরিচয় দিতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছেন এবং অভিনয়ই ছিল তাঁর নেশা ও পেশা এবং জীবনক্ষেত্রে সাফল্যের মূল কারণ।

নাট্যকার হিসেবে উৎপল দত্তের অধিকাংশ রচনাই প্রকৃতপক্ষে প্রয়োজন-নির্ভর; প্রয়োজনীয়তা তৈরি হয়েছিল, যে ধরনের নাটকে তিনি অভিনয় এবং যে প্রকৃতির নাটক তিনি মঞ্চস্থ করতে চান তার তীব্র অভাববোধ থেকে। ঐ-বোধ তাঁকে এতটাই তাড়িত করেছিল যে পরিমণ এবং গুণগত বিবেচনায় তাঁর সৃষ্টিকর্মকে আর কোনভাবেই উনমূল্যে বিবেচনা করা যায় না। উৎপল দত্তের রচিত নাটকের সংখ্যা একশ'রও অধিক— সে সঙ্গে রয়েছে নাটক ও নাট্যতত্ত্ব সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য পরিমাণ মৌলিক ও গবেষণামূলক রচনা। বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষাকেই তিনি তাঁর রচনার মাধ্যম হিসেবে নির্বাচন করেছেন, যখন যা যথার্থ বিবেচনা করেছেন। এই বিপুল রচনাসম্ভার গড়ে উঠেছে অংশত গণনাট্য সঙ্ঘ এবং প্রধানত পঞ্চাশ দশকের শেষদিক থেকে পিপলস থিয়েটার ও পরে লিটল থিয়েটার এবং তাঁর পরিচালিত যাত্রা সংগঠনগুলোর প্রতি দায় ও দায়িত্ববোধ থেকে। অক্লান্ত এবং অবিরাম গতিতে তিনি প্রতিটি নাট্যসম্প্রদায়ের জন্য নাটক সরবরাহ করেছেন কিংবা বলা উচিত নাটক রচনা করতে বাধ্য হয়েছেন ঐ-সকল নাট্যগোষ্ঠীর কর্মতৎপরতা অব্যাহত রাখার তাগিদে। কারণ নাটক তাঁর কাছে কেবল বিনোদনের মাধ্যম নয়, আলো আঁধারির মায়া নয়, সৌখিন মেজাজের আমোদ নয় বরং তা সমাজ বদলের হাতিয়ার, প্রায়-জান্তব পরিশ্রম ও মেধার

শিল্পরূপ[১০]—যেমন আধুনিক কালের পরিশ্রমনির্ভর অন্যবিধ শিল্প। এ-কারণে তিনি স্বগতোক্তির মত প্রায়শই বলতেন 'নাটক মানে সংগ্রাম, নাটক সংগ্রামের হাতিয়ার'।[১১] সুতরাং সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবে যে ধরনের নাটক মঞ্চায়নের জন্য তিনি প্রত্যাশা করেছেন যখনই সে ধরনের নাটকের অভাব বোধ করেছেন তখনই তিনি অভিনেতা বা নাট্যনির্দেশকের দায়িত্বের পাশাপাশি নিজেই তুলে নিয়েছেন নাট্যকারের দায়িত্ব।

উৎপল দত্ত নিজের নামের সঙ্গে কোনদিন কমিউনিস্ট লেবেল যুক্ত করেননি কিংবা পার্টির সদস্য পদও গ্রহণ করেননি, কিন্তু সন্দেহাতীতভাবেই মার্কসীয় চেতনা বিজড়িত ছিল তাঁর সকল নাট্যকর্মের ভিত্তিমূলে। তিনি তাঁর নাট্যদলের সকল সহকর্মীকে বারবার একটি কথাই বলতেন, নাটক বোঝার আগে বুঝতে হবে ডায়ালেকটিকস, যে ডায়ালেকটিকস বোঝে না সে নাটকও বোঝে না। এই বোধ থেকে 'নাট্যজীবনের আদিপর্বেই উৎপল দত্ত সর্বহারা শ্রেণীর অধিকার, ক্ষমতা ও মর্যাদা রক্ষার সংগ্রামকে তাঁর মূল বস্তু করে তুলেছিলেন।'[১২] কিন্তু উৎপল দত্ত মার্কসবাদ চর্চায় এবং রচনাকর্মে তার প্রয়োগে মার্কসবাদীদের রিডাকশনজিম বা অতিতরলীকরণের প্রথাগত ধারণা অনুযায়ী, শ্রমিক হলেই সকল ক্ষেত্রে বীর এবং আমেরিকা মানেই মানবতার শত্রু, এই তত্ত্বে অবিশ্বাসী। সন্দেহ নেই উৎপল দত্তের নাটকের প্রধান বিষয়বস্তু সাধারণ মানুষ এবং তাঁদের অধিকার সংগ্রামের ইতিহাস কিন্তু তিনি ঐ ইতিহাসকে একটি ঐতিহাসিক বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করেছেন। নাটক ও নাট্যতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব ভাবনা সংবলিত গ্রন্থ *Towards A Revolutionary Theatre*-এ নাট্যচিন্তার যে প্রকৃতি তিনি উল্লেখ করেছেন তাকে ব্যাখ্যা করলেই উৎপল দত্তের নাটকে মার্কসবাদ এবং মার্কসবাদী তত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি উপলব্ধি করা যায়। ঐ গ্রন্থে তাঁর নাট্যপ্রকৃতি সম্পর্কে একটি চুম্বক মন্তব্যে বলেছেন:

> From the very beginning of my theatre-work, we have tried to put revolution in a historical perspective. Studying social phenomena in isolation, assuming each phase of development as a whole, that is substituting the General with the Particular, is universal bourgeois voice:[১৩]

বিপ্লবকে যখনই একটি 'Historical Perspective'-এ ধারণ করা হয় তখনই তার মধ্যে অনিবার্যভাবে যুক্ত হয়ে যায় মার্কসবাদী চিন্তা-চেতনা; তৈরি হয়, বিশ্ব-বীক্ষণের মার্কসীয় তত্ত্বদৃষ্টির বাস্তব ভিত্তি। উৎপল দত্ত তাঁর সমগ্র নাট্যকর্মে এই তত্ত্বদৃষ্টিকে অত্যন্ত সচেতন ও শিল্পবৈভবের সঙ্গে প্রয়োগ করেছেন।

কিন্তু মনে রাখা দরকার, যেমন উল্লিখিত, উৎপল দত্ত লেবেল আঁটা মার্কসবাদী নাট্যকার নন: তিনি প্রকৃতপক্ষে মানববাদী এবং সমাজবাদী নাট্যকার। শ্রেণীবিভাজিত সমাজে যেহেতু নিরপেক্ষ কোন শিল্পসাহিত্য অসম্ভব, ফলে উৎপল দত্ত স্বাভাবিকভাবেই শ্রমজীবী এবং নির্যাতিত মানবাত্মার প্রতি তাঁর সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন; কারণ প্রগতিশীল মানুষের সামনে আর কোন নির্ভরযোগ্য

বিকল্প নেই। শিল্পী হিসেবে এটা ছিল উৎপলের মানবিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দায়বোধ। আর উৎপল দত্তের বিস্তৃত পঠন-পাঠনের জগত তাঁকে ঐ দায়বোধ সম্পর্কে সচেতন করেছিল। দেনিস দিদেরো থেকে কান্ট হেগেল হয়ে তিনি পৌঁছেছিলেন মার্কস এবং এঙ্গেলসে। সেখানেও তাঁর অভিযাত্রা সমাপ্ত নয়, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ আত্মস্থ করার জন্য তিনি পরিভ্রমণ করেছেন জিনোভিয়েভ, কামেনভ, ট্রটস্কি, বুখারিনদের পাশাপাশি মাও, লিন পিয়াও এবং একালের গ্রামশি পর্যন্ত।[১৪] এই পঠন-পাঠনের মধ্য দিয়ে তিনি প্রকৃতপক্ষে বুঝতে চেয়েছিলেন মানবসভ্যতার অগ্রগতি ও তার বুদ্ধিবৃত্তিক গতি-প্রকৃতি। ফলে মানবসভ্যতার অগ্রগমনের ইতিহাসই উৎপল দত্তের নাটকের মূল প্রতিপাদ্য হয়ে উঠল। কিন্তু এ-প্রতিপাদ্যকে তিনি অনুধাবন ও আত্মস্থ করতে চেয়েছেন মার্কসের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের তত্ত্ব দিয়ে. আর রচিত নাটকের মাধ্যমে তিনি প্রদান করেছেন মার্কসীয় তত্ত্বের সৃষ্টিশীল ব্যাখ্যা। যেহেতু তিনি উপলব্ধি করেছিলেন সভ্যতার অগ্রগতি মূলত ঘটেছে দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় এবং সেখানে মূলত শ্রেণীদ্বন্দ্বই ক্রিয়াশীল, ফলে তাঁর নাটকও পরিস্ফুট করেছে সেই শ্রেণী-দ্বন্দ্বের চিরন্তন সত্যকে।

মার্কসের মতে, যে কোন যুগে উৎপাদনী-শক্তিগুলির ভিত্তিতে উৎপাদনী সম্পর্কগুলি গড়ে ওঠে। গোড়ার এই সম্পর্কগুলি—প্রভু-ক্রীতদাস, জমিদার-ভূমিদাস, বুর্জোয়া-শ্রমিক—আবির্ভূত হয় উৎপাদনী-শক্তিকে আরো এগিয়ে দিতে, সমাজ তথা ইতিহাসকে আরো এগিয়ে দিতে। কিন্তু কালক্রমে এই শ্রেণীবিন্যাসই হয়ে দাঁড়ায় উৎপাদন তথা সমাজ অগ্রগতির পথে বাধাস্বরূপ। তখন উৎপাদনী-শক্তি ও উৎপাদনী-সম্পর্কের মধ্যে বিরোধ ঘটে এবং অবশেষে নতুন শ্রেণীবিন্যাস ঘটে। ইতিহাসের প্রতি পর্যায়ে উৎপাদনী-সম্পর্কের যে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া, তারই প্রতিফলন হয় সেই যুগের সব সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, আইনে, দর্শনে, ধর্মে, লোকাচারে, রাষ্ট্রে, রাজনীতিতে।[১৫] শোষক-শোষিতের এই সংঘাত চিরকালের এবং আবহমান কাল ধরেই তার বিবর্ধন ও বিবর্তন সমাজ-সম্পর্কের সকল স্রোত-প্রতিস্রোতে ক্রিয়াশীল। এ-কারণে বিশ্বের যেখানেই বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে তার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে সেখানেই দেখা যায় ঐ-দুটো প্রান্ত—একদিকে শোষিত এবং অন্যদিকে শোষক। আর এই দ্বন্দ্বে শোষিত বঞ্চিত মানুষেরা তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নিরন্তর সংগ্রামে লিপ্ত। বিপ্লব, সংগ্রাম এবং রক্তপাতের ইতিহাস ছাড়া নির্যাতিত মানুষ কোনদিন তাদের প্রত্যাশিত মুক্তির স্বাদ পায়নি। সুতরাং শোষিত মানুষের, ভাগ্যাহত মানুষের দুঃখ দুর্দশার একজন নিখুঁত রূপকার হিসেবে উৎপল দত্ত সংগ্রাম এবং বিপ্লবের মধ্যে সাধারণ মানুষের মুক্তির দর্শন খুঁজে পেয়েছেন। তিনি ভেবেছেন বিপ্লবের পথ ধরেই সাধারণ মানুষের মুক্তি আসে এবং ঐ-পথেই পৃথিবীর অগ্রগতি সম্ভাবিত হয়। এক একটি বিপ্লব পৃথিবীর এবং মানব সভ্যতার অগ্রগতির এক একটি স্মারক। এ-কারণে উৎপল দত্তের নাটকে কোন নির্ধারিত ভৌগোলিক অবস্থান মূল্যবান হয়ে ওঠে না; তাঁর নাটকের পটভূমি বিস্তৃত হয় সেখানেই যেখানে সাধারণ মানুষের সংগ্রাম ও বিপ্লবের ইতিহাস সম্পর্কিত হয়ে আছে। এশিয়া থেকে আফ্রিকা, ইয়োরোপ থেকে আমেরিকা; সাঁওতাল উপজাতিদের অধিকার সংগ্রাম থেকে এক হিম্মত বাইয়ের ব্যক্তিক সংগ্রাম সব কিছুই অধিকার করে

থাকে তাঁর নাটকের পটভূমি। বিপ্লবের দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যেহেতু বিশ্বের অগ্রগতি সাধিত হয় তাই "তিনি মার্কসীয় ডায়ালেক্‌টিক্‌স বা দ্বান্দ্বিকতার সূত্রটি সর্বত্রই প্রয়োগ করেন,—যেমন নিজের ক্ষেত্রে, তেমনই তাঁর বিশ্ববীক্ষায়, মানববীক্ষায়।"[১৬] কারণ ঐ তত্ত্বটি উৎপল দত্তের কালে এবং এখনও মানব মনীষাকে বোঝার জন্য সব চেয়ে বড় শস্ত্র।[১৭] জীবন অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে উৎপল দত্তের চেতনা মার্কসবাদী চেতনার সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ; কারণ মার্কসবাদ উৎপল দত্তকে আলোড়িত করেছিল এবং দশ মাসের সম্পর্কে সম্পর্কিত গণনাট্য আন্দোলনও তাঁকে আমূল বদলে দিয়েছিল। কারণ ঐ আন্দোলন তাকে নিয়ে গিয়েছিল 'জনতার মুখরিত সখ্যে[১৮] যা উৎপল দত্তের নাটকের গতিপ্রকৃতি বদলানোর ক্ষেত্রে একটি বড় ভূমিকা রেখেছিল; এবং ছেড়ে আসার পরও গণনাট্যের চেতনাকে তিনি বিসর্জন দেননি[১৯] কিন্তু কখনই তিনি হয়ে ওঠেননি প্রথাবদ্ধ মার্কসবাদী নাট্যকার।

৩

উৎপল দত্তের *ফেরারী ফৌজ*[২০] এবং *রাইফেল* রচিত হয় যথাক্রমে ১৯৬১ ও ১৯৬৮ সালে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের বিখ্যাত কবিতা 'ফেরারী ফৌজ'-এর অনুসরণে উৎপল দত্ত তাঁর নাটকের নাম নির্বাচিত করেছিলেন এবং তা কবির নির্দেশক্রমেই।[২১] *ফেরারী ফৌজ* নাটক প্রসঙ্গে 'নাট্যকারের কথা' শিরোনামে উৎপল দত্ত বলেছেন, "একটা কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন : ফেরারী ফৌজ ঐতিহাসিক নাটক নয়। অথচ অন্য অর্থে ঐতিহাসিকও বটে। কোন বিশেষ ব্যক্তিবর্গ বা বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনাকে এ নাটকে চিত্রিত করা হয়নি। আবার তিরিশ দশকের প্রথম ভাগে পূর্ববাংলায় জেগে-ওঠা যুবকদের বজ্রকঠিন মুখগুলোকে সাধারণভাবে সামগ্রিকভাবে এ-নাটকে ধরে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে"।[২২] অর্থাৎ মধুসূদন দত্ত, গিরিশচন্দ্র ঘোষ বা ডি. এল. রায় যে অর্থে ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেছেন সেই প্রথাগত অর্থে *ফেরারী ফৌজ* কোন ঐতিহাসিক নাটক না হলেও তিরিশের দশকের পূর্ববাংলার বিপ্লবী আন্দোলন এ-নাটকের পটভূমি।

বিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশকে পূর্ববাংলায় যে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন হয়েছিল ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ইতিহাসে তাকে নিয়ে নানামুখী বিশ্লেষণ এবং বিবেচনা সম্পন্ন হয়েছে এবং ঐ আন্দোলন সম্পর্কে বিপরীতমুখী প্রচারণা, সাধুবাদ ও তিরস্কারের ঘটনাও ঘটেছে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে অনেকেই একে সযত্নে ও সচেতনভাবে পরিহার করেছেন, বিশেষত অহিংসবাদীরা; আবার অনেকেই সহানুভূতির সঙ্গে এর রাজনীতিক ও আবেগিক বিষয়গুলো মূল্যায়ন করেছেন। ইংরেজরা একে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন হিসেবে চিহ্নিত করলেও পরবর্তীকালে অনেকেই একে বিপ্লবী আন্দোলন এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সংগ্রামে ঐ-যুগকে অগ্নিযুগ হিসেবে চিহ্নিত ও সম্মানিত করেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের পর কংগ্রেসপন্থীদের গোয়েবলসীয় প্রচারণায় প্রায় প্রমাণিত হয়ে যায় যে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম এসেছে সম্পূর্ণত

গান্ধীজীর নেতৃত্বে, অহিংস আন্দোলনের মাধ্যমে, চরকা এবং খদ্দরের কার্যকারিতায়। ঐ-প্রচারণায় স্বাধীনতা সংগ্রামে অগ্নিযুগের নিঃশঙ্কচিত্ত, অকুতোভয় এবং অকাতরে উৎসর্গীকৃত অসংখ্য তাজা তরুণের আত্মাহুতিকে অপমান ও অসম্মান করে তাদের অবদানকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয়। স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারতের ইতিহাস রচনা এবং প্রচারণার এই একদেশদর্শী প্রবণতা-রোধ এবং সচেতন প্রতিবাদের (consent objector) উদ্দেশ্যেই উৎপল দত্ত তিরিশ দশকের পূর্ববাংলায় সংঘটিত বিপ্লবীদের অকুতোভয় কর্মকাণ্ডকে নিয়ে রচনা করেছিলেন তাঁর অনবদ্য নাটক *ফেরারী ফৌজ*।

রাইফেল নাটকের পটভূমিও অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের স্বাধীনতার সশস্ত্র সংগ্রাম। নাটকের শুরুতেই সূত্রধারের জবানীতে পাওয়া যায় যে, ১৯৩৪ সালে মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর শহরে অবিনাশ বসুর নেতৃত্বে কল্যাণ ঘোষ যে যুবদল তৈরি করেছিল তারা 'বোমার আঘাতে, পিস্তলের গুলিতে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে' চেয়েছিল। তারা অস্বীকার করেছিল গান্ধীবাদ, 'অসহযোগ আর সত্যাগ্রহের নপুংসক নীতিকে'।[২৩] কিন্তু যে বিপুল কর্মযজ্ঞের ব্রত নিয়ে কল্যাণ ঘোষ বা অবিনাশ বোস দেশমাতৃকার পদতলে তাদের জীবন উৎসর্গ করেছিল, কংগ্রেসপন্থীদের প্রচারণায় তারাই হারিয়ে যেতে থাকল বিস্মৃতির অতল গহ্বরে। এক সময় যাদের নামে সমগ্র বৃটিশ শক্তির ভিত নড়ে উঠেছিল মুক্ত স্বাধীন স্বদেশে তাদেরই জীবন প্রবাহিত হচ্ছিল অনাহুত, অবহেলিত এবং নিভৃতে; সঙ্গী কেবল উত্তুঙ্গ বিপ্লবের ধূসর স্মৃতিময়তা। ফ্ল্যাশব্যাক এবং ন্যারেটিভ ড্রামার পদ্ধতি অবলম্বন করে নাট্যকার পরম মমতায় এবং শ্রদ্ধায় 'অগ্নিযুগের' বিপ্লবীদের জীবনদর্শন, আবেগ এবং কর্মতৎপরতাকে তুলে আনলেন *রাইফেল* নাটকে। তিনি সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরলেন 'বিস্মৃতির কাল গহ্বরে বিলীন হওয়া' কাহিনীকে। কারণ ইতিহাসের প্রকৃত সাক্ষী, প্রকৃত রচয়িতা এবং প্রকৃত ধারক তারাই। অথচ তাদেরই ক্রমাগত শুনতে হচ্ছিল চারদিকে ঢক্কানিনাদ, 'দেশ নাকি স্বাধীন হয়েছে খদ্দর পরার ফলে, আমরা এক মনে চরকা কেটেছি বলে!' এই খদ্দরপন্থীরাই ভুলে যেতে চায় ক্ষুদিরামের নাম, ইতিহাস থেকে মুছে ফেলতে চায় সূর্য সেন, লক্ষ্মীবাই, তিতুমীর, নৌ-বিদ্রোহী আর সুভাষ চন্দ্রের সশস্ত্র আই. এন. এ. বাহিনীকে। কারণ তাঁরা তারস্বরে বলে এবং জনগণকে বিশ্বাস করতে বলে যে স্বাধীনতা এসেছে 'বিনা রক্তপাতে', 'স্বাধীনতা এনেছে অসহযোগ, সুভাষ চন্দ্র নয়। স্বাধীনতা এসেছে চরকার জন্য রাইফেলের জন্য নয়।'[২৪] সুতরাং *ফেরারী ফৌজ* এবং *রাইফেল* প্রকৃত পক্ষে অভিন্ন পটভূমিতে রচিত দুটো নাটক যাদের অন্তর্গত সত্যে সম্মিলন ঘটেছে নাট্যকারের একটি বিশেষ জীবনদর্শন, তত্ত্ব এবং শিল্পদৃষ্টির উৎসার। বর্তমান প্রবন্ধ উপর্যুক্ত পটভূমিতে উৎপল দত্তের সমন্বয়ধর্মী শিল্প ও তত্ত্ব দৃষ্টির সাদৃশ্য এবং সৌসাম্য উদ্ঘাটনে প্রয়াসী।

ইতিহাস উৎপল দত্তের একটি প্রিয় অনুসন্ধিৎসা। ইতিহাসের ধারাবাহিকতার সঙ্গে সম্পর্কিত করে মানবপ্রগতি এবং সভ্যতার অগ্রগমন অনুধাবনের একটি অনন্য প্রক্রিয়া তিনি আয়ত্ত করেছিলেন। মার্কস যেভাবে বিশ্বের ইতিহাসকে একটি বিশেষ তত্ত্বদৃষ্টি দিয়ে পর্যালোচনা ও

পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তাঁর যুগান্তকারী মতবাদ প্রতিষ্ঠা এবং অনিবার্য করে তুলেছিলেন, উৎপল দত্ত, প্রধানত তাঁকেই অনুসরণের মাধ্যমে বিনির্মাণ করেছিলেন নিজস্ব তত্ত্বদৃষ্টি এবং জীবনবোধ। আগেই বলেছি, উৎপল দত্ত মার্কসবাদী নন কিন্তু যে মানবতাবাদী এবং সামাজিক দায়িত্ববোধ থেকে তিনি নাট্যরচনায় প্রয়াসী হয়েছিলেন তার একটি তাত্ত্বিক-রাজনীতিক পটভূমি ছিল, যার সঙ্গে মার্কসবাদের অনেকখানি সাযুজ্য আবিষ্কার সম্ভব। শিল্পীর সামাজিক দায়বদ্ধতা, তত্ত্ব-রাজনীতির অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ এবং প্রবল মানবতাবাদ এবং মানব সম্ভাবনায় প্রবলভাবে আস্থাশীল জীবনদৃষ্টি উৎপল দত্ত সার্বক্ষণিক সক্রিয় রেখেছেন তাঁর সৃষ্টিশীল কর্মকাণ্ডের অভিপ্রায় হিসেবে। আর সৃষ্টিশীল অভিপ্রায়ের অনিবার্য অনুষঙ্গ হিসেবে ইতিহাস তাঁর শিল্পীসত্তার দায়বদ্ধতা পূরণের একটি প্রধান শস্ত্র। কারণ নাট্যকারের অব্যবহিত কর্তব্য হচ্ছে "সমাজে এই মুহূর্তে যা রয়েছে গোপন, তা প্রকাশ করে জনতার সামনে তুলে ধরা, যা রয়েছে বীজের মতো, তাকে বিরাট মহীরুহ করে জনতার সামনে তুলে ধরা"।[২৫]

উৎপল দত্তের নাটকে রাজনীতিক দুরভিসন্ধির দ্বারা লালিত সংগোপন সত্যকে জনতার সামনে তুলে ধরার এক প্রধান অস্ত্র ছিল ইতিহাস। ভারতবর্ষের ইতিহাস পর্যালোচনা করে বিদেশি এবং বিদেশিদের বেতনভুক্ত এদেশীয় সেবাদাসদের সূক্ষ্ম অভিসন্ধি উপলব্ধি করেছিলেন উৎপল দত্ত। তিনি বুঝেছিলেন, ব্রিটিশ শাসনকে ভারতবর্ষে অনিবার্য বা যাথার্থ্য প্রমাণের জন্য যা প্রয়োজন তা হচ্ছে এমন একটি আপাতশুদ্ধ ইতিহাস ভারতবাসীর সামনে উপস্থাপন করা যাতে ইংরেজরাই আমাদেরকে 'প্রাগৈতিহাসিক পশু' থেকে মানুষে রূপান্তরিত করেছে তা প্রমাণিত হয়। একমাত্র এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক শৃঙ্খলের এবং অমানবিক অত্যাচারের যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করা যায়। কিন্তু উৎপল দত্ত তাঁর শিল্পীসত্তার দায়বদ্ধতা দ্বারা বুঝেছিলেন, ঐ দুরভিসন্ধি ব্যর্থ করতে প্রয়োজন দেশের মানুষকে তাঁদের সংগ্রামশীলতার ঐতিহ্য অবহিত করা; ইতিহাসের মুল্যায়ন, পনুর্মূল্যায়ন এবং তার যথার্থতা সাধারণ মানুষের সামনে উপস্থাপন করা। সে জন্য তিনি লিখছেন :

> অতএব আমাদের জরুরী কাজ হলো ভারতের সশস্ত্র ইতিহাসকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা, জনগণের সংগ্রামী ঐতিহ্যকে দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করা, বার বার সশস্ত্র বিদ্রোহীদের বীরোচিত কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করা, শহীদের স্মরণ করা। অহিংস সংগ্রামের বিশাল ধাপ্পাবাজির মুখোশ উন্মোচনটাও আমাদের জরুরী কর্তব্য—যা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে নিরন্তর সহযোগিতা—তা তড়িঘড়ি গণ অভ্যুত্থানকে ঠেকাবার জন্য প্রত্যাহার করে নেওয়া, যেমনি ঘটেছিল চৌরীচৌরা-র পরবর্তী সময়ে অথবা লর্ড আরউইনরের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরের ঘটনাই হোক—যখন বিপ্লবী জনগণ বৃটিশ মেশিনগানের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে লড়ছিল।[২৬]

উৎপল দত্ত *ফেরারী ফৌজ* এবং *রাইফেল* নাটকে যেভাবে তাঁর তত্ত্বদৃষ্টির প্রতিফলন ঘটান তাকে বলা যায় টোটাল থিয়েটার, যেখানে তাঁর পেশাগত দক্ষতার পরিচয় চিহ্নিত হয়ে আছে নাটকের প্রতিটি স্তরে। মঞ্চ সজ্জার দিক দিয়ে যদি নাটকের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা যায় তবে উপলব্ধি করা যাবে ঐ দুটো নাটকেই তিনি একই সঙ্গে প্রথাবদ্ধতা এবং প্রথাবিরুদ্ধতার সংযোগ সাধন করেছেন। *ফেরারী*

ফৌজ রচিত হয়েছিল মিনার্ভা থিয়েটারের জন্য— এবং সেখানেই হয় ঐ-নাটকের প্রথম প্রদর্শনী— এবং পরবর্তীকালেও তার অধিকাংশ প্রদর্শনী হয়েছিল মিনার্ভা থিয়েটারে। কিন্তু *রাইফেল* রচিত হয়েছিল বিবেক যাত্রা দলের জন্য এবং তার প্রথম দিককার অধিকাংশ প্রদর্শনী হয়েছিল বাংলাদেশের প্রত্যন্ত গ্রামে, যদিও শেষ দিকে কিছু প্রদর্শনী মিনার্ভাতেও হয়েছিল। ফলে *ফেরারী ফৌজ* ও *রাইফেল* নাটকের অভিন্ন পটভূমি সত্ত্বেও চারিত্র্যগত পার্থক্য রয়েছে সুস্পষ্ট। *ফেরারী ফৌজ* নাটকে উৎপল দত্ত যে সেট নির্মাণের কথা বলেছেন তা মূলত আমাদের গৃহকেন্দ্রিক বা প্রসেনিয়াম থিয়েটারে যে ধরনের সেট নির্মাণ করা যায় তার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। কিন্তু যাত্রার দৃশ্যপট না থাকায় তার সঙ্গে দর্শকের সম্পর্ক প্রত্যক্ষ। দুটি নাটকের রচনাকালীন চেতনাগত পার্থক্যের কারণে উৎপল দত্ত *রাইফেল* নাটকে মনোযোগী হয়েছেন মুক্ততার দিকে। ফলে *রাইফেল*-এর প্রথম দৃশ্যে মঞ্চসজ্জার বর্ণনা বিরল, একটি মুক্ত আবহে সূত্রধারের বর্ণনার মধ্য দিয়ে দর্শক সরাসরি কাহিনীর মূলকেন্দ্রে প্রবেশের অধিকার অর্জন করে। সূত্রধার, দর্শক এবং নাট্যপ্রবাহের মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে একটি অনিবার্য সাঁকো তৈরি করে দেয়। এখানে নাট্যকার যাত্রার মুক্ততাকে কাজে লাগিয়ে সূত্রধারের মাধ্যমে দর্শকের কল্পনাকে উদ্বেলিত ও উদ্বোধিত করেন এভাবে, 'ধরুন এটা বহরমপুর থানার সম্মুখস্থ মাঠ, যার নাম স্কোয়ার-ফিল্ড'[২৭] এবং সূত্রধারের ঐ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই দর্শক যেন একটি মুক্ত মঞ্চকে বহরমপুর থানার সামনের মাঠ ভেবে নেয়, উন্মুখ হয়ে প্রবেশ করে নাট্যপরিমণ্ডলে।

কিন্তু *ফেরারী ফৌজ* নাটকের প্রথম দৃশ্যে মঞ্চসজ্জার দীর্ঘ বর্ণনার মাধ্যমে নাট্যকারের শিল্পীসুলভ দৃষ্টিবৈভব ও তীক্ষ্নতার পরিচয় পাওয়া যায়; এবং সেই সঙ্গে উদ্ভাসিত হয়ে মঞ্চের সঙ্গে নাট্যকারের প্রত্যক্ষ পরিচয়ের অনিবার্য প্রমাণ :

> ভুবনডাঙা গীর্জা ময়দানে হ্যাজাগ বাতির নীলাভ আভায় যাত্রা হচ্ছে। অদূরে গোথিক কায়দায় গীর্জার দরজা। পালার নাম সমাজ, রচয়িতা মুকুন্দ দাস। বৃদ্ধেরা বসেছেন রোয়াকের ওপর, জমিদারবাবুর আশেপাশে। ছেলেবুড়ো কৃষকের দল বসেছে মাটির উপর। চিকের পেছনে মেয়েরা। পালা জমে উঠেছে। বিবেকের কণ্ঠস্বর শোনা যায়— তার পঞ্চমে আকুল স্বর। দর্শকরা হায় হায় করে ওঠেন। গান গাইতে গাইতে প্রবেশ করে এক দীর্ঘকায় পুরুষ, গেরুয়া আলখাল্লা পাগড়ি-পরা। দেশমাতৃকার-বন্দনা করছেন বিবেক। চোখে জল আসে দর্শকের।[২৮]

ফেরারী ফৌজ নাটকের এই দৃশ্যসজ্জার দ্বারা উৎপল দত্ত প্রসেনিয়াম থিয়েটারের দর্শকের চেতনায় প্রমুক্ততা সঞ্চারের চেষ্টা করেছেন। মঞ্চনাটকে বিবেকের মত যাত্রা-উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে তিনি প্রচলিত নাট্যকাঠামোয় যে নিরীক্ষা আরোপ করলেন, তা সংগতিপূর্ণভাবে মিশে গেল আমাদের চেনা নাট্যজগতের সঙ্গে। তবে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে যাত্রার বিবেকের আগমন ঘটে বারংবার, এখানে তেমন ঘটেনি; নাট্যকার একবার মাত্র সূত্রধারের প্রবেশের মধ্য দিয়ে যাত্রা আবহ এবং পরিমণ্ডলটিই

কেবল সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন, যা দর্শকের সামনে একটি গিমিক সৃষ্টিতে অবদান রেখেছে। অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে মঞ্চের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ তার সামনে যখন যাত্রাপালার একটি প্রোটোটাইপ দৃষ্টিগোচর হয় তখন স্বাভাবিকভাবেই জেগে ওঠে তার স্মৃতিসত্তা; খুলে যায় তার মানসিক রুদ্ধতার বাতাবরণ এবং দর্শক উন্মুখ হয় নাটকের গতিধারার প্রতি। এভাবে নাটকের মঞ্চে যাত্রার স্মৃতি-অনুষঙ্গ ব্যবহারের এই নিরীক্ষাধর্মিতাকে খুব সহজে দর্শক অগ্রাহ্য করতে পারে না। তাছাড়া *ফেরারী ফৌজ* নাটকের সূত্রধার হিসেবে যাকে ব্যবহার করা হয়েছে তিনি একটি ঐতিহাসিক চরিত্র, যাকে প্রায় সকল বাঙালিই চারণ কবি হিসেবে চেনে, মুকুন্দ দাস। ফলে দর্শকের আগ্রহ অধিকতর হতে বাধ্য ঐ কবির পরিচিতি লাভের পর। নাট্যক্রমের অব্যবহিত পরবর্তীকালে দেখা যায় ব্রিটিশরাজের বাধ্যগত পুলিশ বাহিনীর সদস্য হিতেন দাশগুপ্ত মুকুন্দ দাসকে গ্রেফতার করে ১৮৭৬ সালের অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন বলে:

> হিতেন ॥ ১৮৭৬ খৃস্টাব্দের নাট্যাভিনয় আইন বলে আপনার এই অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ করা হলো। এ নাটকের পাণ্ডুলিপি সব ক'টা আমার হাতে দিন।
>
> [একজন ভীত সন্ত্রস্ত অভিনেতা যাত্রার ষাট এনে পুলিশের হাতে দেয়।]
>
> আপনাকে আমার সঙ্গে আসতে হবে।
>
> মুকুন্দ ॥ গ্রেপ্তার করছেন?
>
> হিতেন ॥ আজ্ঞে না, তবে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে আপনাকে উপস্থিত হ'তে হবে।
>
> মুকুন্দ ॥ চলুন । ভাই রে, তেত্রিশ কোটি লোককে কোন ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে উপস্থিত করবেন, জানতে ইচ্ছে করে।
>
> [বিপ্লবী কবি মুকুন্দ দাসকে নিয়ে যায় পুলিশ।][২৯]

পুলিশ মুকুন্দ দাসকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায় বটে কিন্তু দর্শকের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে যায় এমন এক বিপ্লবী চেতনা যা একটি বিপ্লবী নাটক উপভোগের উপযোগী সংবেদনশীল সচেতন মন তৈরির ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

উৎপল দত্ত তাঁর অধীত ডায়ালেকটিকস অনুযায়ী তাঁর অধিকাংশ নাটকের মত *ফেরারী ফৌজ* নাটকেও দু'শ্রেণীর চরিত্রের সমাবেশ করেছেন। যার একদিকে রয়েছে উইলমট-এর মত বৃটিশ পুলিশ অফিসার এবং তার দোসর ইনস্‌পেক্টর হিতেন দাশগুপ্ত, সাব ইনস্‌পেক্টর প্রকাশ মুখুটি, কনস্‌টেবল, এ. এস. আই, জমিদার ব্রজেন চৌধুরী; আর অন্যদিকে রয়েছে বিপ্লবীদের দল— অশোক, দেবব্রত, জ্যোতির্ময়, বিপিন, সিরাজুল, আর বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষিত অশোকের পরিবার— যেখানে রয়েছে তার বিপ্লবী মা-বাবা, স্ত্রী ও শিশুকন্যা গোপা। বলা বাহুল্য, চরিত্রগুলোকে নাট্যকার সুস্পষ্টভাবে বিভাজন করে তাদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব ও বিরোধকে অবলম্বন করে নাট্যকাহিনীর অগ্রগতিকে সম্মুখগামী করেন। উৎপল দত্তের নাটকের একটি বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তাতে কাহিনীনির্ভর

দ্বন্দ্ব কখনোই মুখ্য হয়ে ওঠে না, কাহিনীতে তিনি কোথাও তেমন চমক সৃষ্টি করেন না কিন্তু মূল নাট্যদ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয় চরিত্রসমূহের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মাধ্যমে।

উৎপল দত্ত সৃষ্ট নাট্যচরিত্রেরা নির্দ্বন্দ্ব ও নিস্তরঙ্গ নয়। তারা প্রতিনিয়ত দ্বন্দ্বমুখর—সে দ্বন্দ্ব ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির, ব্যক্তির সঙ্গে পরিবারের, ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের এবং ব্যক্তির সঙ্গে সমগ্র শাসন ব্যবস্থার। অর্থাৎ নাট্যকার ব্যক্তিকে মৌলিক বা ইউনিট ধরে নিয়ে তার দ্বন্দ্বসূত্রগুলোর বিস্তার সাধন করেন। কিন্তু উৎপল দত্তের নাটকের আরেকটি বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাঁর চরিত্রেরা খুব বেশিক্ষণ একাকী যাপন করে না— শারীরিক এবং মানসিক উভয় দিক দিয়েই। কাহিনীর অগ্রগতির মধ্য দিয়ে দেখা যায়, ক্রমশ চরিত্রগুলো হয়ে উঠছে একেকটি উদ্দেশ্যের বা আদর্শের মোটিফ, আবদ্ধ থাকছে না ব্যক্তিমানুষের সামান্য পরিসরের সীমানায়। ফলে ব্যক্তিক দ্বন্দ্বই বিস্তারিত হয়ে যায় পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে এবং এভাবে আরোহী পদ্ধতি অনুসরণের একটি পর্যায়ে দেখা যায়, সম্পূর্ণ বাব্যস্থাটার সঙ্গেই সাধারণ-সামাজিক মানুষ সংগ্রামমুখর, দ্বৈরথে অবতীর্ণ। আর এই দ্বন্দ্ব-দ্বৈরথকে কেন্দ্র করেই উৎপল দত্তের নাটকের অগ্রগতি সম্ভাবিত হয়। উৎপল দত্তের নাটকে, যেমন ঘটেছে *ফেরারী ফৌজ* ও *রাইফেল* নাটকে, কাহিনীর বিস্তার তেমন ঘটেনা যেমন ঘটে চরিত্রপুঞ্জের বিচিত্রমুখী দ্বন্দ্বের বিস্তার; এই বহুমুখী দ্বন্দ্বমূলক অগ্রসরমানতাই হচ্ছে উৎপল দত্তের নাটকের মূল প্রাণশক্তি।

ফেরারী ফৌজ নাটকে বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষিত মানুষগুলো তত্ত্বগতভাবে ভুলতে চায় তাদের ব্যক্তিক জীবনকে, তারা বিশ্বাস করতে চায় যে 'বিপ্লবীর ব্যক্তিগত জীবন বলে কিছু নেই'[৩০] 'সব বন্ধন কাটিয়ে তবে না যোদ্ধা হয় মানুষ'[৩১] 'রিক্ত নিঃস্ব, বন্ধনহীন হয়ে সত্যিকারের যোদ্ধা' হতে চায়;[৩২] নেতার নির্দেশ তাঁরা অবিচলিত বিশ্বাসে এবং অবিচ্যুত নিষ্ঠায় পালন করে কিন্তু আত্মদ্বন্দ্বের তীব্র কশাঘাত থেকে মুক্ত হতে পারে না—যেমন ঘটেছে *ফেরারী ফৌজ*-এর অশোক বা জ্যোতির্ময়ের জীবনে আর *রাইফেল*-এর বীরেনের বিপ্লবী জীবনে। তাদের জীবনে দ্বন্দ্ব সংঘাতের সৃষ্টি হয় দর্শনগত বিবেচনায় বরং সে দ্বন্দ্বের বিস্তার ঘটে ব্যক্তি থেকে পারিবারিক জীবনে। অন্যদিকে ধর্ম বিশ্বাসের কারণে জ্যোতির্ময়ের সঙ্গে দ্বন্দ্বের উৎপত্তি হয় সমগ্র সংগঠনের সঙ্গে। অশোকের স্ত্রী যখন অশোকের সঙ্গে তার মানবিক সম্পর্কের অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত করে তাদের রাজনীতিকে, তখন অশোকের কাছে আর কোন প্রত্যুত্তর অবশিষ্ট থাকে না।

ছায়ামূর্তি ॥ শচী।

[চমকে ওঠে শচী। অশোক এগিয়ে আসে,—হাত দিয়ে চেপে ধরে শচীর মুখ।]

আমি, আমি! চীৎকার কোরো না, একটা কথা নয়।

[শচী জড়িয়ে ধরে স্বামীকে, বুকে মাথা রেখে কাঁদতে থাকে। তার গায়ে হাত বুলোয় অশোক।]

ছায়ামূর্তি ॥ একি? কাঁদছ? তোমাকে দেখে আমি কোথায় শক্ত হবো—না ভেঙে পড়ছ এভাবে।

শচী ॥ দু-মাস। দুটো পুরো মাস। তোমাদের রাজনীতি বুঝি না, কিন্তু যে রাজনীতি তোমাকে আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে তাকে আমি মানব না. মানতে পারব না।[৩৩]

আবার একইভাবে জ্যোতির্ময় তার ব্যক্তিসত্তার কারণে সংঘ থেকে বিভাজিত হয়ে পড়ে। কারণ অন্যদের মত নয়, সে নিবিড়-নিশ্চিন্তভাবে বিশ্বাস করে ঈশ্বরকে, যা তার সহযাত্রীরা করে না, বরং ঘৃণাই করে—

জ্যোতির্ময় ॥ ভগবানের ডাক্ অশোক, প্রে টু গড—। শান্তিদারে তিনি স্ট্রেংথ দেন—।

অশোক ॥ ভগবান মানি না। জ্যোতির্ময়, তুমি পুজো করো?

জ্যোতির্ময়॥ হ, এভ্‌রি ডে—।

অশোক ॥ তারপর আবার জামার তলায় রিভলভার নিয়ে খুন করতে যাও?

জ্যোতির্ময় ॥ হ—।

অশোক ॥ ভগবান তাতে খুশি হন?

জ্যোতির্ময় ॥ ধর্ম আর বিপ্লব যে কন্‌ট্রাডিক্টরি কেডা কইল? ধর্মসংস্থাপনায় তিনি নিজেই আবির্ভূত হইতেন, আমরা প্রক্‌সি দিতে আছি মাত্র—।[৩৪]

ব্যক্তি বা আত্মদ্বন্দ্বের এই রূপই সার্থকতার সঙ্গে চিত্রিত হয় উৎপল দত্তের *ফেরারী ফৌজ* নাটকে। আর এই দ্বন্দ্বই ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে খুঁজে পায় এ-সত্য যে আদর্শের সংগ্রামে সে আর ব্যক্তি নয়, 'একটি বিন্দু মাত্র', সম্পূর্ণ মানুষ নয়, তখনই সে ক্রমাগত জড়িয়ে পড়ে বহুস্তরীভূত দ্বন্দ্ব-দ্বৈরথে; ঘটে যায় আদর্শের সঙ্গে তার পার্থক্য, লক্ষ্যের সঙ্গে তার বিরোধ, পদ্ধতির সঙ্গে তার মানসিক বৈলক্ষণ্য এবং সহযোদ্ধার সঙ্গে মূল্যবোধগত ভিন্নতা। উইলমট সাহেবকে প্রকাশ্য দিবালোকে শহরের মাঝখানে হত্যা করার পর পতিতা নারী রাধারানীর ঘরে যখন সকল বিপ্লবী আশ্রয় নেয় এবং সুড়ঙ্গ কেটে কবরখানা পর্যন্ত পৌঁছে নতুনভাবে বৃটিশ নিধনের পরিকল্পনা করে তখন বিপ্লবীদের মধ্যকার পারস্পরিক কথোপকথন এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য :

অশোক ॥ এই হত্যাকাণ্ডের আবশ্যকতা কি? প্রয়োজন কি? উদ্দেশ্য কি? একজন উইলমটকে মারলাম। তার জায়গায় আরেক পুলিশ সুপার আসবে। সে হবে উইলমটের চেয়েও হিংস্র, উন্মত্ত, নিষ্ঠুর। মেরে মেরে ইংরেজ রাজত্ব শেষ হবে?

কুমুদ ॥ একটা স্ফুলিঙ্গ থেকেই অগ্নিকাণ্ড হয়। আমাদের পিস্তলের আগুন থেকেই পুরো দেশে দাবানল লেগে যাবে।

অশোক ॥ অর্থাৎ আমরা এমনই অতিমানব যে আমাদের বীরত্বে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশব্যাপী ভ্যাড়ার সামিল জনতা ক্ষেপে উঠে ঢুঁ মারতে শুরু করবে। মাপ করবেন, অমন ধৃষ্টতা আমার নেই।

দেবব্রত ॥ চট্টগ্রামের অভিজ্ঞতা অনেকটা তাই বটে। গণজাগরণে তো হলো না। মাঝখান থেকে—

[থেমে যান। কুমুদ তাঁর দিকে তাকায় রোষভাবে।]

কুমুদ ॥ জনতা ভ্যাড়ার সামিল একথা আমি বলি নি, অশোকদাই বলেছে ; আমি বলছি জনতা নেতৃত্ব চায়।

অশোক ॥ সে নেতৃত্ব দেয়ার যোগ্যতা রাখো তুমি ?

কুমুদ ॥ আমি রাখি না, শান্তিদা রাখেন।

বিপিন ॥ নিশ্চয়ই।

অশোক ॥ মাস্টারদা যেখানে পারেন নি, ভগৎ সিং যেখানে ব্যর্থ হয়েছেন? না, আমার মনে হয় শান্তিদাও পারে না। কোন লোক একা পারে না। জনতা নিজেই পারে সে কাজ করতে। নিজের সংগঠন সৃষ্টি করতে। লেনিন বলেছেন—

[থেমে যায়। কুমুদ প্রায় গর্জে ওঠে।]

কুমুদ ॥ লেনিন বিদেশে যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, আমরা সে পদ্ধতি নেব কেন?

অশোক ॥ নেব, কারণ পরাধীনতা সব দেশেই এক— আফ্রিকায়, রাশিয়ায়, ভারতে। বিদেশী বর্জনকে অমন ridiculous limits-এ নিয়ে যেও না, কুমুদ, যে পিস্তলটা ব্যবহার করছ সেটাও বিদেশে তৈরী।[৩৫]

কিন্তু অশোকের দ্বন্দ্বের মীমাংসা হয় না, সকলের মধ্যে থেকেও, তাদের অবিসংবাদিত নেতা শান্তি রায়ের সকল আদেশ নিঃশঙ্ক চিত্তে মেনে নিয়েও ক্রমশ একা হতে থাকে। অশোকের এই মানসিক নিঃসঙ্গতা সম্পর্কে জ্যোতির্ময়ের দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন অসাধারণ এবং গভীর চেতনাদ্যোতক উচ্চারণ এখানে স্মরণযোগ্য; যেখানে জ্যোতির্ময় বলছে "অশোক যেমন পোলিটিক্যাল কারণে লোনসাম আছিল, আমিও আমার রিলিজিয়ন হেতু বড় একা।"[৩৬] কিন্তু অশোক বা জ্যোতির্ময় খুব বেশিক্ষণ একা থাকে না, তাদের যুক্তি ও প্রশ্নের ধার অন্যকেও ক্রমাগত সংক্রমিত, আলোড়িত করে। যে প্রশ্ন উত্থাপন করে একসময় অশোক সমিতির মধ্যে একা হয়ে পড়ে, অভিন্ন প্রশ্ন নতুন করে উত্থাপন করে জ্যোতির্ময়, উচ্চারণ করে বিপিন। ফলে তৈরি হতে থাকে প্রশ্নের বিশাল একটি বৃত্ত, যার কেন্দ্রে মুখোমুখি অবস্থান নেয় বিপ্লবীদের সকল কর্মকাণ্ড এবং প্রশ্নকারীরা। আর প্রশ্নমালাসৃষ্ট ঐ বৃত্তের সাহায্য নিয়ে উৎপল দত্ত অত্যন্ত সচেতনভাবে দেখাতে চেষ্টা করেন, বিপ্লব যেমন কালান্তরের পথে ধাবমান তেমনি বিপ্লবকে কেন্দ্র করে উচ্চারিত ঐ প্রশ্নবিদ্ধতাও তার অনুগামী। প্রশ্নহীন, বিবেচনাহীন বিপ্লব অনুসরণ মাঝে মাঝেই হয়ে ওঠে নিষ্ঠুরতার নামান্তর। প্রশ্ন করতে গিয়ে তারা হয়তো ভুল করেছে কিন্তু সে ভুলটাও ছিল সুন্দর, সে ভুলের মধ্যে ছিল সৎ উদ্দেশ্য, মাতৃভূমির পরাধীনতা মোচন। সে কারণে ফাদার ফ্ল্যানাগান যখন উচ্চারণ করেন—

আয়ারল্যাণ্ডে ডি ভ্যালেরার সিন ফাইন দলও ভুল করেছিল। তবু ওরা জিতেছে। ভুল করলেও ঈশ্বর মার্জনা করেন, কিন্তু নির্ভুল ধর্মাচার অনেক সময়ই পাপ হয়ে ওঠে। করুক ভুল করুক ওরা। তারপর একদিন দে উইল বীট দেয়ার সোর্ডস ইনটু প্লাওশেয়ারস্ এণ্ড দেয়ার উইল বি নো মোর ওয়র![৩৭]

—তখন মনে হয় নিঃস্বার্থ কর্মটাই বড়, গীতার নিষ্কাম কর্মযোগের মত, ভুল বা ঠিক তার বিচার তো ইতিহাসের অন্তহীন প্রশ্নমুখরতার কাছে।

উল্লিখিত তাত্ত্বিক বোধ থেকেই উৎপল দত্ত বিপ্লবী চরিত্রগুলোকে অমানবিক করে তুলতে পারেন না, তারা মানবিক ও যুক্তিগ্রাহী কিন্তু লক্ষ্য অর্জনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাঁর চরিত্রেরা কখনই ভুলে যায় না তাদের মানবিক বৃত্তি, জীবনের সৌন্দর্য এবং ভবিষ্যতের স্বপ্নময়তার কথা; তারা সহিংসাতার মধ্যে দিয়ে গেলেও মূলত অন্বেষণ করে জীবনের শুদ্ধতা এবং শোষণমুক্ত একটি সমাজ ব্যবস্থা। ফলে হত্যাকাণ্ডের পরই তারা খুঁজে ফিরেছে মানুষ হত্যার যৌক্তিক কারণ; খুঁজে নিচ্ছে জীবনের অপার সৌন্দর্যের একটি ব্যাপকতর প্রান্তর। ব্যাপক পুলিশি তৎপরতায় চারদিকের প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে বিপ্লবীরা যখন জীবন মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তখনও জ্যোতির্ময়ের কথোপকথন দর্শক-পাঠকের সামনে খুলে দেয় চিন্তার একটি চরম সূত্র এবং এই উচ্চারণের মধ্য দিয়েই যেন আমরা শুনতে পাই নাটকের মূল প্রতিপাদ্য :

জ্যোতির্ময় ॥ শহর ঘিইরা ফেলছে শোনলেন না?

দেবব্রত ॥ তবু যে কাজ হাতে নিয়েছ করে যেতে হবে।

জ্যোতির্ময় ॥ কি লাভ? গেইন কি হইব?

দেবব্রত ॥ তার মানে ? সপ্তকাণ্ড রামায়ণ পড়ে এখন—

জ্যোতির্ময় ॥ মাস্টার মশাই, মৃত্যু অবধারিত। তখন হেই ডেথ এর মুখোমুখি আইস্যা ভাবি কেমনে বাঁচি? অশোক কইত লইফ ইজ বিউটিফুল! অখন বুঝি। বুঝি যে সত্যই বাঁচবার চাই। জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ জিনিস জীবন।

দেবব্রত ॥ কাওয়ার্ড। শেষ মুহূর্তে পিছিয়ে যাচ্ছ। বিশ্বাসঘাতক!

জ্যোতির্ময় ॥ কথা। ওয়ার্ডস। শুনতেই মন্দ লাগে না। যে কাজ দিছে শান্তিদা করুম। কিন্তু মনরে আর ডিসিভ করুম না। হ ভয় পাইতেছি—ভীষণ ভয়ে অন্তরাত্মা কাঁপতে আছে। এবং আই অ্যাম নট এশেমড! জীবন ভালবাসি হেই কথা কইতে আর লজ্জা পাই না।[৩৮]

বলা বাহুল্য, এইসব অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত বিপ্লবীদের মাতৃভূমির প্রতি প্রেম এবং কর্মনিষ্ঠায় কোন খাদ ছিল না, ছিল না লক্ষ্যের ব্যাপারে কোন আপসকামিতা। কারণ 'এটা নীতির লড়াই, এখানে কোন আপস হতে পারে না'।[৩৯] সে কারণে তারা পুলিশের হাতে ধরা পড়ার চেয়ে আত্মবিসর্জনকেই শ্রেয় মনে করেছে—সায়ানইড বা শত্রুর প্রতি তাক করা অব্যর্থ পিস্তলও মুহূর্তে ঘুরে যায় নিজের হৃদপিণ্ড বা মস্তিষ্ক লক্ষ্য করে। কিন্তু এত সব কিছুর পরও ধরা পড়ে গেলে তাদের মুখ থেকে সমিতি সম্পর্কে পুলিশ কোন তথ্যই উদ্ধার করতে পারে না। ভীষণ দর্শন পুলিশ যখন তাদেরকে বহুমাত্রিক এবং নানা উদ্ভাবনী প্রক্রিয়ায় অত্যাচার করত তখনও তারা নির্বিকার এবং অত্যাচার সহ্য করার একটি আসুরিক শক্তি যেন তাদের মধ্যে এসে যেত। ফলে এদের দেশপ্রেমকে ব্রিটিশ পুলিশের কাছে মনে

হয় 'হিস্টিরিয়া' রোগবিশেষ। কারণ তাদের কাছে 'দেশপ্রেম জিনিসটাই একটা স্নায়বিক রোগ'। ফলে জাঁদরেল এবং দৈত্যাকৃতি পুলিশের কণ্ঠেও শোনা যায় আক্ষেপের সুর :

> প্রকাশ ॥ আমরা হাঁপিয়ে পড়লাম আর ছেলেটা—নাঃ? এদের মাথায় কিছু গোলমাল আছে। কিসের এত জেদ বুঝি না। মরবিই তো।
>
> হিতেন ॥ মরেও জিততে চায়, বুঝলেন না?[৪০]

একই রকম কথা শোনা যায় *রাইফেল* নাটকেও পুলিশ ইন্সপেক্টর ইনগ্রামের উক্তিতে। সরোজ বর্ধনের বাড়ি ঘেরাও করার পর একা মহীতোষ যুদ্ধ করে মৃত্যু বরণ করে। তাকে লক্ষ্য করে ইনগ্রাম এবং পুলিশ অফিসার মানিকের কথোপকথনের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় বিপ্লবীদের এই আপসহীন মানসিকাতর চিত্র :

> মানিক ॥ স্যার খারাপ খবর। সাদা বস্তা নিয়ে মাত্র একজনই ছিল। মরেছে। ছ' জায়গায় গুলি লেগেও লড়ে গেল সমানে। এই দেখুন—(স্ট্রেচারের ঢাকনা সরান)—মহীতোষ পাল। সপ্তম গুলিটা হৃৎপিণ্ড ফুটো করে দিতে তবে মরলো।
>
> ইনগ্রাম ॥ ক্রাইস্ট! হি ইজ স্মাইলিং! হাসি লেগে আছে ঠোঁটে। মানুষ না দেবতা এরা? ... গড—দ্য বয় ইজ স্মাইলিং, লাফিং অ্যাট মি! আমার দিকে চেয়ে ব্যঙ্গের হাসি হাসছে![৪১]

পুলিশ কোনভাবেই যখন অশোকের কাছ থেকে কোন তথ্য বের করতে পারে না তখন তারা অন্য পথে অগ্রসর হয়। তারা 'অশোক চাটুয্যে যে দুর্দমনীয় বিপ্লবী এই কিংবদন্তীটা শেষ করে' দিতে চায়। তারা প্রথমে নষ্ট করে দেয় অশোকের দেহ তারপর তার সুনাম। সর্বত্র রটানো হয় অশোকের দেয়া তথ্যের ভিত্তিতেই পুলিশ খুঁজে পাচ্ছে বিপ্লবীদের সকল আস্তানা। তাদের রটনাকে বিপ্লবীদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য প্রতিটি অপারেশনের সময় ভাল কাপড় পরিয়ে অশোককে বসিয়ে রাখে তাদের গাড়িতে যদিও তার দিকে সর্বক্ষণ তাক করা থাকে অস্ত্র এবং গাড়ির সঙ্গে বাঁধা থাকে তার পা। কিন্তু পুলিশের রটনাকেই সত্য ধরে বিপ্লবীরা বিশ্বাসঘাতক অশোকের জন্য সমিতির পক্ষ থেকে মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করে। অশোক যখন তার বাবা যোগেনের কাছ থেকে ঐ-পরোয়ানা শুনতে পায় তখন সমগ্র বিপ্লব প্রক্রিয়া এবং বিপ্লবী সংগঠন সম্পর্কে ব্যক্ত করে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন দার্শনিক উচ্চারণ :

> শান্তি রায় তাঁর দলকে রক্ষা করছেন, বিপ্লবকে রক্ষা করছেন, দেশকে রক্ষা করছেন। তিনি মহান, তিনি বিরাট, আক্রমণের সম্ভাবনাতেই তাঁকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করতে হয়। অশোক চাটুয্যে সেই বিরাট প্রস্তুতির মধ্যে সামান্য একটা বিন্দু মাত্র, একটা জ্যামিতিক বিন্দু। কিন্তু তোমাদের কাছে আমি একটা পূর্ণাঙ্গ মানুষ, সম্পূর্ণ মানুষ। তোমাদের গায়ের রক্তে মাংসে আমার দেহ গড়ে উঠেছে। শান্তি রায়ের পক্ষে যে মানুষটাকে বোঝা অসম্ভব, তোমাদের পক্ষে সেটা সম্ভব হবে না?[৪২]

সমিতির কাছে বিশ্বাসঘাতক, মা-বাবার কাছে অবিশ্বাসী, স্ত্রীর অনুকম্পা বঞ্চিত কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই নির্দোষ এক অসহায় মানুষ অশোক। গ্রিক ট্রাজেডির নিয়তির মত একের পর এক তার নির্ভরতা, বিশ্বাস ও সম্ভাবনার আলোকমালা নির্বাপিত হয়ে যেতে থাকে। বিপর্যস্ত, বেদনাহত, আশাহত বিপ্লবী অশোক এক সময় মৃত্যুকেই তাঁর জীবনের সকল বিপর্যয় থেকে উত্তরণের একমাত্র সমাধান বলে মেনে নেয়। কারণ, সে কোন ভাবেই তার মা-বাবা বা স্ত্রী-কন্যাকে এই দোষ নিয়ে বাঁচতে দিতে চায় না যে তারা একজন বিশ্বাসঘাতকের জন্মদাতা, দেশদ্রোহীর স্বামী বা কন্যা। জীবনের এই পরম পরিণতিকে এবং চরম ট্রাজেডিকে নাট্যকার শিল্পকুশলতায় দর্শকের সহানুভূতির যোগ্য করে তোলেন যখন নাটকের শেষ দৃশ্যে.শান্তি রায় নিজের হাতে অশোককে হত্যা করার পর জানতে পারে পুলিশ অফিসার দেবযানীর প্রেমিক কুমুদই হচ্ছে প্রকৃত বিশ্বাসঘাতক, অশোক নয় :

> শান্তি ॥ অশোক বিদ্রোহ করেনি রে! সেটা শুনে আমার যে কি আনন্দ আজ! অশোক শহীদ হয়েছে। আমি নিজের হাতে তাকে গড়ে তুলেছিলাম। আজ নিজের হাতে তাকে মেরেছি রে। ... অশোক বিশ্বাসঘাতক নয়, সবাইকে বলিস। কিন্তু কে তবে? কে বিকিয়ে দিল সমিতিকে, দেশকে তার নেতাকে? জেলের মধ্যে হাস্নুহানার ঝোপে —বুঝলে কুমুদ—একটা পাখি এসে বসত—চন্দনা। রোজ আসত সকালে শিস দিত। জেলের প্রাচীরের মধ্যে সে এক আশ্চর্য ব্যতিক্রম। কুমুদ![৪৩]

মৃত্যুর সঙ্গে প্রতিনিয়ত বসবাস করে জীবনের প্রতি এই যে প্রবল তৃষ্ণা তাই *ফেরারী ফৌজ* নাটকের প্রকৃত সত্য এবং নাটকের যথার্থ আবেদন সেখানেই নিহিত। সকলের মুক্তির জন্য, কৃষকের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য 'কুমুদের প্রেম, জ্যোতির্ময়ের পড়াশুনা' এসব কিছুর জন্য তিরিশের দশকে পূর্ব বাংলায় অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত তাজা তরুণ বিপ্লবীরা যে বিপ্লব শুরু করেছিল তার নির্দিষ্ট পটভূমি থাকলেও তাকে বদ্ধ করার যায় না প্রথাগত সময়ের ধারণায়; কারণ বিপ্লবের কোন সময় নেই, সীমা নেই, শেষ নেই— তা সহজেই অতিক্রম করে যায় ইতিহাসের গণ্ডি, সমকালের বৃত্তাবদ্ধতা। এই অনিঃশেষ বিপ্লবের মন্ত্রই শুনতে পাওয়া যায় নাটকের অন্তিম উক্তি হিসেবে, একজন সাধারণ শ্রমিক যখন উচ্চারণ করে যে 'শান্তি রায় অমর। শান্তি রায়ের মৃত্যু নাই।'—তার মধ্যে দিয়ে।

৪

ফেরারী ফৌজ নাটকের মত *রাইফেল*ও বিপ্লবীদের কর্মকাণ্ড এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে জীবন উৎসর্গের চেতনায় উদ্ভাসিত তারুণ্যের মহান ব্রত নিয়ে রচিত। রাইফেল প্রকৃতপক্ষে *ফেরারী ফৌজ* নাটকের উত্তরাংশ, যার বীজ ও দর্শন লুকিয়ে আছে *ফেরারী ফৌজ* নাটকটিতেই। তবে এ-নাটকে একটি বিষয় যুক্ত হয়েছে তা হচ্ছে বিপ্লবী আন্দোলনে কৃষক শ্রেণীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ। *ফেরারী ফৌজ*-এ নানা পেশা ও শ্রেণীর মানুষের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়;—ছাত্র-যুবক-স্কুল শিক্ষক-শ্রমিক; এমন কি পতিতা নারী পর্যন্ত ঐ নাটকের পাত্রপাত্রী হিসেবে উঠে এসেছে কিন্তু কোন

কৃষকের স্থান নেই সেখানে। সে অভাব পুষিয়ে নেবার জন্যই বোধ করি *রাইফেল* নাটকের একটি প্রধান চরিত্র হিসেবে নির্বাচিত হল রহমৎ শেখ---যে একজন সর্বহারা কৃষক এবং যার একমাত্র পরিচয় বিপ্লবী আন্দোলনের আপসহীন যোদ্ধা। এ-কথা সত্য, প্রথাগত অর্থে উৎপল দত্ত ইতিহাস নিয়ে নাটক রচনা করেন না, কিন্তু কোন অবস্থাতেই ইতিহাসের সত্যকে বিকৃতও করেন না। যেমন আলোচ্য দুটি নাটকের মাধ্যমে তিনি একটি সত্য উচ্চারণ করলেন যে, বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনে কেবল বাঙালি হিন্দুরই নিরঙ্কুশ অংশগ্রহণ বা বাংলার বিপ্লবে কেবল শ্রমিক শ্রেণীর মানুষেরই অংশগ্রহণ ছিল না, ছিল হিন্দু-মুসলমান, শ্রমিক-কৃষক সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা।

রাইফেল নাটকে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক বিষয়ের সংশ্লেষ ঘটেছে : *ফেরারী ফৌজ* নাটকে চরিত্রগুলোকে ক্রিয়াশীল দেখা যায় বটে কিন্তু অশোক ছাড়া কারো পারিবারিক পরিচয় সেখানে উপস্থাপিত বা নির্দেশিত নয়, ব্যক্তি পরিচয়ই ঐ-নাটকে প্রধান। কিন্তু *রাইফেল* নাটকে যে সকল চরিত্রের সাক্ষাৎ আমরা পাই তারা প্রায় সবাই উঠে আসে তাদের সামাজিক ও পারিবারিক পরিচয় নিয়ে। কল্যাণ ঘোষ, অবিনাশ, বীরেন বা রহমৎ প্রত্যেকের পারিবারিক অবস্থাটি কোন না কোনভাবে নাটকে উচ্চারিত এবং তারা ক্রিয়াশীল তাদের পারিবারিক পরিমণ্ডলের মধ্যে অবস্থান করে বা পারিবারিক পরিমণ্ডলকে অস্বীকার করে। দুটি নাটকের চরিত্র নির্বাচনগত পার্থক্যের কারণও কিন্তু সচেতনভাবে ঘটেছে উৎপল দত্তের তত্ত্বদৃষ্টির সঙ্গে সমান্তরাল গতিতে এবং সৌসাম্য প্রতিষ্ঠিত করে। *ফেরারী ফৌজ*-এ মূলত বৃটিশবিরোধী আন্দোলনে ব্যক্তিক অবদানকে মূল্যায়ন, মূল্যবান ও মহিমান্বিত করে তোলা হয়েছে। কিন্তু *রাইফেল* নাটকে নাট্যকারের এই তত্ত্বদৃষ্টি পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত। এ-নাটকে নাট্যকার পরিবর্তিত বোধে উত্তীর্ণ যে, ব্যক্তিক আন্দোলনকে ক্রমশ ব্যক্তি থেকে পরিবারে, পরিবার থেকে সমাজে এবং সমাজ থেকে সমগ্র রাষ্ট্রব্যবস্থায় ছড়িয়ে দিতে না পারলে প্রকৃতপক্ষে আন্দোলনের সাফল্য ক্রমশ দূরবর্তী হতে থাকবে। ফলে *ফেরারী ফৌজ*-এর ব্যক্তিক দ্বন্দ্বকে তিনি এখানে পারিবারিক দ্বন্দ্বের চিত্রে রূপান্তরিত করলেন। এবং সচেতন পাঠকের পক্ষে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে তিনি চরিত্রের এবং চরিত্র-অবস্থানের মাত্রাগত এই পরিবর্তনের মাধ্যমে ক্রমশ বিবর্তিত হতে চাইছেন নতুন তত্ত্বদর্শনের অভিমুখে।

আগেই বলেছি, *ফেরারী ফৌজ* নাটকে বিপ্লবীদের বৃটিশবিরোধী তৎপরতা বিচ্ছিন্ন, ব্যক্তিগত বা সামান্য সংঘশক্তি দ্বারা পরিচালিত এবং বিরুদ্ধশক্তিগুলোর মধ্যে কোন ঐকান্তিক ঐক্য নির্মাণের প্রয়াস ছাড়ই তারা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ এবং চলিষ্ণু। ব্যক্তিগত পর্যায়ে বৃটিশবিরোধী সচেতনতা সিপাহী বিপ্লবের পর থেকেই ক্রমশ প্রকট ও প্রকাশিত হতে থাকে। ১৮৮৩ সালে বন্দিদশায় এবং ভারতবর্ষের বাইরে বাসুদেব বলবন্ত ফাড়কের মৃত্যু, ১৮৯৭-৯৯ সালের মধ্যে চাপেকার ভ্রাতৃবৃন্দের ফাঁসি, বিনায়ক রাণাডের আত্মদান বাংলার জনগণের মধ্যে বিপ্লবের অগ্নিস্পর্শ সঞ্চার করেছিল। পি.মিত্র ও সরলা দেবীর নেতৃত্বে কলকাতায় যে 'অনুশীলন সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার সদস্যেরা কেবল শরীর চর্চা ও জ্ঞান চর্চাতেই নিবেদিত ছিল না, অত্যন্ত সচেতন এবং সতর্কতার সঙ্গে বৃটিশ

বিরোধী চেতনাকে এদেশের তরুণ সমাজের মধ্যে সঞ্চারিত করার কাজেই তারা ছিল অধিকতর মনোযোগী। 'অনুশীলন সমিতি'র শাখা ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হলে এর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন পুলিনবিহারী দাস। কলকাতা এবং ঢাকার এই অনুশীলন সমিতিকে কেন্দ্র করেই বিপ্লবের প্রথম দিকে গুপ্তসমিতিগুলো কাজ করত। কিন্তু ১৯০৫ সালের পূর্ব পর্যন্ত এসব আন্দোলন ছিল ক্ষীণধারায় প্রবাহিত অত্যন্ত সংগোপন সচেতনতায় মন্ত্রগুপ্তির মত। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে গুপ্ত বিপ্লবী আন্দোলনগুলো সক্রিয় ও প্রকাশিত হয়ে ওঠে। তবে তখনও পর্যন্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিপ্লবীদের মধ্যে পারস্পরিক আদানপ্রদান এবং সমঝোতা যে খুব একটা ছিল তেমন মনে হয় না।[৪৪] কিন্তু রডা অস্ত্র লুণ্ঠনের ঘটনার পর (২৫ আগস্ট ১৯১৪) ভারতবর্ষের রাজনীতিতে, বিশেষত বিপ্লবী আন্দোলনে একটি গুণগত পরিবর্তন ঘটে। গুপ্ত বিপ্লবীরা সংগুপ্ত হয়েই রইল বটে কিন্তু তাদের কর্মতৎপরতা এতটাই প্রবল ও প্রকটভাবে প্রকাশিত হতে থাকল যে বৃটিশ শাসনের দীর্ঘ দুশো বছরের ভিতে তীব্র আলোড়ন উপস্থিত হলো। *ভারতে সশস্ত্র-বিপ্লব* গ্রন্থের রচয়িতা ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত-রায় ঐ-ঘটনার রাজনীতিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে বলেছেন, "তৎকালীন রাজনীতিক অবস্থা পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় যে, ঐতিহাসিক ও বৈপ্লবিক গুরুত্বে রডা-য়্যাক্‌শান্ বস্তুতই অনন্য সাধারণ। রডার অস্ত্রে সজ্জিত হয়েই বাঙলার বিপ্লবীরা দল ও গোষ্ঠী নির্বিশেষে বহু ক্ষেত্রে তাঁদের বিপ্লব-সংগ্রামকে প্রচণ্ডতর করেছেন। অধিকন্তু, বালেশ্বরের চাষখন্দে বিপ্লব-মহানায়ক যতীন্দ্রনাথ মুখার্জি ও তাঁর দুর্জয় সতীর্থবৃন্দ এই অস্ত্র নিয়েই ঐতিহাসিক যুদ্ধ করে অমর হয়েছেন।"[৪৫]

ভারতে বৃটিশ বিরোধী সশস্ত্র বিপ্লব যখন শুরু হয় তখন বিপ্লবীদের লক্ষ্য ছিল একটাই, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা; কিন্তু তাঁর কর্মপদ্ধতি এবং রাজনীতিক-দার্শনিক ভিত্তি খুব পরিচ্ছন্ন এবং সুদৃঢ় ছিল এমন মনে হয় না। বৃটিশদের কর্মকাণ্ডের প্রতি প্রবল ঘৃণা এবং উপনিবেশ-শৃঙ্খলিত ক্রোধ থেকে মূলত বিপ্লবীরা চালিত এবং পরিচালিত হয়েছিল। তা ছাড়া কংগ্রেসিদের আমলাতান্ত্রিক মনোভাব ও আচরণ, সুভাষ বসুকে তিরস্কার এবং পরবর্তীকালে বহিষ্কার করার মধ্যে দিয়ে তারা যে নপুংসক নীতিকে তোষণ করছিল তার বিরুদ্ধে উত্থিত ক্ষোভ থেকেও বিপ্লবীরা সশস্ত্র আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। আন্দোলনের গতিপ্রাপ্তি ও অগ্রসরতার সঙ্গে সঙ্গে তাদের সামনে এসে উপস্থিত হয়েছে নানা তাত্ত্বিক প্রশ্ন এবং বাস্তব সমস্যা। আর সেগুলোর সমাধানের উদ্দেশ্যেই তাঁরা খুঁজেছিল তাঁদের রাজনীতিক ও তাত্ত্বিক ভিত্তিভূমি।

বিপ্লবীরা বিপ্লবের সুবাদেই বুঝেছিল একজন করে বৃটিশ হত্যার মধ্য দিয়ে তারা যে বৃটিশবিরোধী আন্দোলনের তাত্ত্বিক রূপ প্রদান করেছে তার মধ্যে সত্যের চেয়ে আবেগ এবং বাস্তববুদ্ধির চেয়ে স্বপ্নচারিতার প্রাবল্যই বেশি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই *ফেরারী ফৌজ* নাটকে অশোক যেমন প্রশ্ন করেছিল এই হত্যাকাণ্ডের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য নিয়ে তেমনি বিপিনও প্রশ্ন করেছিল সহযাত্রীকে, "এমনি ধারা খুন করতি করতি কি মানুষরে জাগায়ে তোলা যাবে? নাকি অন্ধকারে পথ

হাতড়ায়ে মরতিছি সকলে মিলি।"[৪৬] অশোক বা বিপিন যে ভাবনার সূত্রপাত করেছিল তাকেই বিপ্লবীরা নতুন করে একটি তত্ত্বভিত্তি প্রদান করে এবং *রাইফেল* নাটকে দেখা যায় তারই বহিঃপ্রকাশ। *রাইফেল* নাটকে অবিনাশের কথায় ধরা পড়ে সেই নব্যবিপ্লব সম্ভাবনা, "না ভাবছি। গত দশ বছর ধরে এ ভাবনার শেষ নেই। একক বীরত্বে কোন লাভ নেই। মহাবীর যতীন মুখার্জী পারেন নি, পারেন নি মহানায়ক সূর্য সেন। আমরা কে? চাই গণফৌজ, তাদের হাতে চাই রাইফেল। চাই দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ। চাই পাল্টা স্বাধীন সরকার। এ ছাড়া কোন পথ নেই। অন্যপথ ধরতে গেলে শুধু কল্যাণ ঘোষের মত বীরদের হারাবো। আর চাই বেইমান-নিধন। জমিদার, কোটিপতি-মালিক, গুপ্তচর— সবাইকে শেষ করতে।"[৪৭] এই সব প্রশ্নের মধ্যে দিয়ে বিপ্লবীরা তাদের আন্দোলনের পদ্ধতি পুনঃনির্ধারণ করে। তারা বুঝতে পারে যে আমেরিকায় ওয়াশিংটন, ইংল্যান্ডে ক্রমওয়েল, ফ্রান্সে রোব্‌স্‌পিয়ার, ইটালিতে মাৎসিনি, রাশিয়ায় লেনিন কিংবা আয়াল্যান্ডে ডি-ভ্যালেরার আন্দোলন যে সফল হয়েছিল, তার প্রধান কারণ গণজাগরণ। সুতরাং গণজাগরণের মাধ্যমেই তাদের বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে; এবং তারা এটাও অনুধাবন করেছিল গণজাগরণ নিরস্ত্র হয়ে কোন লাভ নেই তাকে হতে হবে সশস্ত্র। সর্বহারার বিপ্লব আসে অস্ত্রের শক্তির পথেই, রাইফেলের মাধ্যমে কারণ "ওগুলো এক একটা বিপ্লব-সম্ভাবনা"।[৪৮] ফলে সশস্ত্র গণবিপ্লবের উদ্দেশ্য নিয়ে যে আন্দোলন অগ্রসর হয়েছিল তাকেই নাট্যরূপ দিয়েছিলেন উৎপল দত্ত তাঁর *রাইফেল* নাটকের মাধ্যমে।

রাইফেল নাটকের শুরুতেই দেখি থানার সেপাইদের কাছ থেকে বেদের ছদ্মবেশ ধারণ করে ভানুমতির খেল দেখানোর নাম করে রাইফেল লুট করে নিয়ে যাচ্ছে বিপ্লবীরা। রাইফেল নিয়ে যাবার সময় তারা নিজেদের পরিচয় দিচ্ছে 'স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রজাতান্ত্রিক ফৌজ' বলে। দ্বিতীয় দৃশ্যে দেখা যায় লুণ্ঠিত রাইফেলগুলো কল্যাণদের বাড়িতে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। লুকিয়ে রেখে আসার সময় অবিনাশ কল্যাণের বোন মানসীকে যা বলে তার মধ্যেই নিহিত *রাইফেল* নাটকের মূল সত্য :

অবিনাশ ॥ এই বস্তায় আছে চারটে রাইফেল আর চারশ বুলেট। লুকিয়ে রাখতে হবে। পারবে?

মানসী ॥ হ্যাঁ।

অবিনাশ ॥ জীবন দিয়ে রক্ষা করতে হবে, বোন। অস্ত্র সংগ্রহ শুরু হলো মাত্র। পূর্ববঙ্গের বহু জায়গায় শুরু হয়ে গেছে। আমরাও এ-জেলায় শুরু করলাম আজ। ভবিষ্যৎ মুক্তিফৌজের জন্য গড়ে তুলতে হবে গোপন অস্ত্রাগার। একা একা বা তিন-চারজন মিলে গোটাকয়েক সাহেবকে গুলি করে মেরে লাভ নেই। বৃটিশ শাসক অত সহজে হার মানবে না। এটা বুঝেছিলেন সূর্য সেন। তাই তাঁরা রাইফেল সংগ্রহ করে বিরাট জনতার হাতে অস্ত্র দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন। আমরাও শুরু করলাম। এক-একটি রাইফেলের জন্য যদি এক-একটি করে প্রাণও বিসর্জন দিতে হয় তাও স্বীকার। পারবে, বোন?[৪৯]

—এ-উচ্চারণের মাধ্যমে বোঝা যায় বিপ্লবীদের পরিবর্তিত যুদ্ধের কৌশল; তারা বিপ্লবীশক্তির সঙ্গে ঔপনিবেশিক অপশক্তির জনযুদ্ধের কথা বিবেচনা করছে এবং তারা বুঝতে পেরেছে ঐ-জনযুদ্ধের মধ্য দিয়ে এদেশের কৃষিক শ্রমিকের আকাঙ্ক্ষিত মুক্তি আসবে।

সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের পাশাপাশি কংগ্রেস যে পদ্ধতিতে বৃটিশবিরোধী আন্দোলন করেছে তাকে তারা কোনভাবেই শ্রদ্ধা বা সমর্থন করতে পারেনি। গান্ধীজীর নেতৃত্বে ঐ আন্দোলনকে তাদের কাছে মনে হয়েছে একটি ভাওতা; ধনিক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষায় তৎপর হলেও, এদেশের কৃষক শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কংগ্রেস একটি নিষ্ক্রিয় শক্তি। কারণ "কংগ্রেসকে টাকা যোগাচ্ছে বাজাজ, বিড়লা, সূতাকল-মালিক সারাভাই—গান্ধীজী নিজে স্বীকার করেছেন। বিড়লার টাকায় যে সংগঠন চলে সেটা কি গরীবের জন্য লড়ে?"[৫০] ফলে সাধারণ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই যেটি, তা কেবল বৃটিশ শাসকদের বাংলাদেশ থেকে তাড়ানোর লড়াই নয়। সাধারণ মানুষকে একত্রিত হয়ে তাদের অধিকার নিজেদেরই প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এবং সে সঙ্গে তাদের প্রধান শ্রেণীশত্রুকেও খতম করতে হবে। কারণ সাধারণ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বৃটিশরা যেমন, তেমনি তাদের এদেশীয় দোসরাও অন্যতম অন্তরায়। বিপ্লবীরা স্বপ্ন দেখেছিল "স্বাধীন ভারত মানে কৃষকদের ভারত, শোষণহীন ভারত" যে ভারত "গান্ধীজীরও নয়, জমিদারের নয়। কৃষকেরই দেশ।"[৫১] মানসী এবং কল্যাণের মধ্যেকার কথোপকথনের মাধ্যমে তাদের আন্দোলনের তাত্ত্বিক ভিত্তি সম্পর্কে গভীরভাবে জানা যায় :

> মানসী ॥ বুঝতে পারছি না যে! এ দেখ না—এই বলছে ইংরেজ মেরে দেশকে মুক্ত করো, এই আবার বলছে, জমিদার আর বড়লোকদের মারো, নইলে দেশ মুক্ত হবে না। জমিদার আর বড়লোক তো দেশের মানুষ। তাদের মারতে বলছে কেন?
>
> কল্যাণ ॥ কেন, চোখের মাথা খেয়েছিস? এ-দেশে দেখছিস না, যুগল চৌধুরীর মত জমিদার বৃটিশদের দালাল, টাটা-বিড়লারা বৃটিশের দালাল। তারা বৃটিশ-শাসনের সুবিধা ভোগ করছে! তাই শুধু ইংরেজ তাড়ালে হবে না, দিশি দালালদেরও তাড়িয়ে বিপ্লব করতে হবে। কলিনস বলেছেন —মুক্তিযুদ্ধ আর বিপ্লব একই। এটা বাদ দিলে ওটা হয় না। দেশী জমিদার আর কোটিপতিদের সঙ্গে আত্মীয়তা পাতিয়ে যে স্বাধীনতা আসে, সেটা স্বাধীনতা নয়, অবাধ শোষণ। জনতা তখন ক্ষুধায় জ্বলে পুড়ে সেই মেকি স্বাধীনতার দাম দেয়, আর সাহেব ও দেশী বড়লোকেরা টাকার পাহাড়ে বসে হাসে। দিশি বড়লোকদের রং কালো হলেও, তারা আর আমরা এক জাতি নই, এক দেশের মানুষ নই—এটা মনে রাখতে বলছেন কলিন্‌স্।[৫২]

সুতরাং কলিন্‌স পড়ে বিপ্লবীরা যে আন্দোলনের তত্ত্বভিত্তি তৈরি করেছিল তার মধ্যে অবশ্যই শ্রেণীশত্রুর বিষয়ে সর্বত্রই সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিল। এজন্য তারা পণ করেছিল, প্রত্যেকেই শপথ করেছিল, "আমি ভারতের মুক্তিকামী প্রজাতন্ত্রী ফৌজের সৈনিক শপথ করছি—দেশমাতৃকার জন্য জীবনদান হচ্ছে আমর পণ, ফৌজের শৃঙ্খলাই আমার ধর্ম, নীরবে আদেশ পালন আমার কর্তব্য, রাইফেল আমার অস্ত্র।"[৫৩]

সুতরাং বিষয়টিকে আমরা এভাবে দেখাতে পারি, *ফেরারী ফৌজ* নাটকের মধ্যে বৃটিশবিরোধী বিপ্লব দানা বেঁধে উঠেছে কিন্তু তা উঠেছে ব্যক্তিগত বা ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর সচেতনতা থেকে। কিন্তু

রাইফেল নাটকে ঐ সচেতনতা লাভ করেছে একটি তত্ত্বভিত্তি এবং তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শ্রেণী-সচেতনতা। দুটো নাটকের কাহিনী কাঠামোতে তেমন কোন মৌলিক পার্থক্য নেই এই চেতনাগত পার্থক্য ছাড়া। *ফেরারী ফৌজ* নাটকে দেখা যায় সকল প্রকার বিশ্বাসযোগ্যতার প্রমাণ দেবার পরও অশোককে বিশ্বাসঘাতকের তকমা এঁটে বিপ্লবীদের বধ্য হয়ে উঠতে হয়, *রাইফেল* নাটকেও দেখা যায় এমন এক রহমৎকে যে সর্বাংশে বিপ্লবে-বিশ্বাসী থাকার পরও পুলিশি অপতৎপরতার কারণে বিপ্লবীদের কাছে বিশ্বাসঘাতক হিসেবে নিন্দিত হয়ে পড়ে। কিন্তু দুটো নাটকেই যারা প্রকৃত বিশ্বাসঘাতক তারা দর্শকের কাছে পরিচ্ছন্ন হয়ে গেলেও বিপ্লবীদের কাছে থেকে যায় অজ্ঞাত। যেমন *ফেরারী ফৌজ* নাটকে কুমুদ বা *রাইফেল* নাটকে বীরেন কিন্তু ধরাছোঁয়ার বাইরেই থেকে যায় এবং স্বাধীনতার পর তারাই প্রসাশনের কাছ থেকে সবচে বেশি স্বাধীনতার সুফল ভোগ করে। বিপ্লবীদের বিপ্লবের ব্যর্থতার কি এটি একটি বড় কারণ নয় যে তারা শত্রু-মিত্র চিনতে ভুল করেছিল? কিন্তু বিপ্লব সম্পর্কে তাদের একটি সামগ্রিক, প্রজ্ঞাপূর্ণ এবং অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন উপলব্ধি ছিল যার সঙ্গে সত্যিই কোন বিপ্লবের তুলনা হয় না। অবিনাশ তাঁর সারা জীবনের বিপ্লবকে মূল্যায়ন করে এভাবে, "আমি তো মরবই। আমরাও ব্যর্থ হয়েছি, এতো দিবালোকের মতন স্পষ্ট। তাই মরতেই হবে আজ বাদে কাল। আমরা চলন্ত শবদেহ মাত্র। আমাদের কাজ শুধু দিয়ে যাওয়া, দিতে দিতে শুকিয়ে ঝরে যাওয়া, বীজের মতন ছড়িয়ে যাওয়া দেশের ভিজে মাটিতে, যাতে সেখান থেকে—সেই মাটির গভীর থেকে—উত্থিত হয় সশস্ত্র গণদেবতা।"[৫৪]

এই সশস্ত্র গণদেবতার স্তব গানই প্রকৃতপক্ষে উৎপল দত্তের দুটো নাটকের মূলসত্য।

তথ্যনির্দেশ

১. "১৮৭২ সালের ডিসেম্বর মাসে ন্যাশনাল থিয়েটার নামে সর্বপ্রথম পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা হয় যেখানে সাধারণে দর্শনীর বিনিময়ে নিয়মিত অভিনয় দেখার সুযোগ পেত। এর আগে ধনী ব্যক্তির বদান্যতার ওপর নির্ভর করত, এবং সেখানে সাধারণের বড়ো একটা প্রবেশাধিকার ছিল না।" ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত*, কলিকাতা, ১৯৯২, মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ. ৩৫৫

২. এ-প্রসঙ্গে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য :

ক. "নাট্যরচনার সংখ্যাধিক্যে গিরিশচন্দ্র বাঙ্গলার নাট্যকারগণকে হারাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু বৈচিত্র্যহীনতার জন্য এই সংখ্যাধিক্যের মূল্য খুব বেশি নয়। গীতিনাট্যের কথা বাদ দিলে তাঁহার প্রায় পঁয়তাল্লিশখানি মুখ্য রচনার বদলে চারখানি মাত্র লিখিলে তাঁহার যশোহানি ঘটিত না।" সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* (তৃতীয় খণ্ড), কলকাতা, ১৩৮৬, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ. ৩৫২

খ. "তাঁহার শ্রেষ্ঠতা তাঁহার সমসাময়িক কালের গণ্ডী উত্তীর্ণ হইয়া আসিতে পারে নাই।" আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস*, কলিকাতা, ১৯৭৫, এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ. পৃ. ৫৭৯

গ. "অভিনয়, নাট্যালয়, অভিনয়-শিক্ষা প্রভৃতি নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত থেকেও তিনি যে কি করে শতাধিক নাটক লিখলেন তা ভাবলেও অবাক হতে হয়। অবশ্য একথা ঠিক যে অসংখ্য নাটক-নাটিকা লিখলেও এর অনেকগুলোই শুধু দর্শকদের চাহিদা মেটাবার জন্য রাতারাতি লেখা হয়েছিল, নাট্যকার এর নাট্যলক্ষণ বা সাহিত্যগুণের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেননি। এমন কি, কিছু অপ্রিয় হলেও বলা যায়, এই শতাধিক নাটকের ক'খানি শতবর্ষ পরে বাঁচবে তাতে গভীর সন্দেহ আছে।" ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫৫

৩. বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'বাবু' প্রবন্ধে এদেরকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে : "যাহাদের তীর্থ ন্যাশনাল থিয়েটার তিনিই বাবু"।

৪. *নাচঘর* (জুন ৩,১৯২৭) পত্রিকায় একটি সাক্ষাৎকারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন, "সর্বসাধারণের জন্যে নয়—যাঁরা ললিতকলার সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে চান—তাঁদের জন্যে কি বাংলাদেশে একটি অতিরিক্ত রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা করা চলে না? ... সাধারণ রঙ্গালয় দর্শকদের মুখ চেয়ে যেমন চলছে চলুক, অতিরিক্ত রঙ্গালয়ের সঙ্গে তার কোন সম্পর্কই থাকবে না। এখানে যেসব নাটক নির্বাচিত হবে, কলা-রসিকদের উন্নত মনে তা ভাবের রেখাপাত করতে পারবে। সর্বসাধারণের উপযোগী নয় বলে যে-সব উঁচুদরের নাটক সাধারণ রঙ্গালয়ে অচল এখানে অনায়াসেই সেই সব নাটকের অভিনয় সম্ভব হবে। এমন রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা হলে আমাদেরও অভিনয় দেখতে সাধ হয় এবং মনের ভিতর নাটক লিখবার ইচ্ছা জাগে।" উদ্ধৃত, দর্শন চৌধুরী, *গণনাট্য আন্দোলন*, ১৯৯৪, কলিকাতা, অনুষ্টুপ প্রকাশনী, পৃ. ২-৩

৫. রঙ্গমঞ্চ, বিচিত্র প্রবন্ধ, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, কলিকাতা, ১৪০২, বিশ্বভারতী, পৃ. ৬৮০

৬. ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০৯

৭. ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এমন একটি সন্দেহপূর্ণ মন্তব্য প্রকাশ করেছেন এভাবে : "এখনও সাম্প্রতিক নাট্য সাহিত্যে এমন কোন প্রথম শ্রেণীর নাট্যকারের আবির্ভাব হয়নি যাকে বর্তমান নাট্য-সাহিত্যের প্রতীকবিন্দু বলে গ্রহণ করা যায়। অভিনয়ের কৃতিত্ব ও কৌশল এ ধরনের নাটককে সাম্প্রতিক জনপ্রিয়তা দিলেও দু'চার বছর পরে এগুলির মধ্যে ক'খানা জীবন্ত আকারে বেঁচে থাকবে তাতে গভীর সন্দেহ আছে। সাম্প্রতিক সমস্যা সাম্প্রতিক নাটককে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে যে, এ সমস্যার উত্থান-পতনের ওপর একালের নাটকের জনপ্রিয়তা ওঠানামা করছে তাপমান যন্ত্রের পারদের ওঠানামার মতো। অভিনয়ে যেমন একক-অভিনয়ের রোশনাই সৃষ্টির অবকাশ কমে আসছে, যৌথ অভিনয়ের দিকে সকলের দৃষ্টি পড়ছে—তেমনি অসংখ্য নাট্যকারের ভিড়ে কোন একজন বিশেষ নাট্যকার মাঝারিকে ছাড়িয়ে স্বাতন্ত্র্যের একাকীত্বে উঠতে পারছেন না।" *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬১০-১১

৮. The theatre, an art more broadly based poetry or abstract painting without being, like the mass media, the collective product of corporations, is the point of intersection where the deeper trends of changing thought first a larger public, 'Martin Esslin, *The Theatre of the Absurd*, England, 1968, Penguin Books, p. 14.

৯. *Towards A Revolutionary Theatre* (M.C. Sarkar & Sons Private Ltd. 1982, Calcutta) গ্রন্থের প্রথম ফ্ল্যাপে রচয়িতার পরিচয় প্রদান করা হয়েছে এভাবে: Utpal Dutt (b. 1929), one of the India's most popular film stars, in even better known as a major playwright and director and actor in the radical theatre ... Director of the People's Little Theatre in Calcutta, he remains the most controversial and colourful figure in India theatre today.

১০. The "Work" of the theatre is indeed hard work. Robert Cohen, *Theatre*, USA, 1981, Mayfield Publishing Company, p. 10.

১১. উৎপল দত্ত, জপেনদা জপেন যা, পৃ. ১২৫

১২. পবিত্র সরকার, ভূমিকা, *নাটক সমগ্র*, ১ম খণ্ড, উৎপল দত্ত, কলিকাতা, ১৯৯৪, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, পৃ. ৫। অতঃপর কেবল *নাটক সমগ্র* নির্দেশিত হবে।

১৩. Utpal Dutt, *Towards A revolutionary Theatre*, ibid.

১৪. নৃপেন্দ্র সাহা, *বাংলার রাজনৈতিক থিয়েটারে উৎপল দত্ত*, কলকাতা, ১৯৯৮, পুস্তক বিপণী, পৃ. ১৬

১৫. Karl Marx, Selected Works, Vol. 1, Moscow, 1947, p. 356 । উদ্ধৃত , উৎপল দত্ত. *শেক্সপিয়রের সমাজ চেতনা*, কলিকাতা, ১৪০৫, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ. ১-২

১৬. পবিত্র সরকার, ভূমিকা, *নাটক সমগ্র*, ১ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭

১৭. 'It would, to be sure, be singularly unMarxist to regard Marxism itself as pollitically bankrupt while still a useful tool of intellectual analysis.' Terry Eanleton & Drew Milen eds. *Marxist literary Theory* , USA, Blackwell Publishers Introduction Part 1, by Terry Eagleton, p.2

১৮. উৎপল দত্ত গণনাট্য সংঘ মধ্য কোলকাতা শাখায় যোগদান করেন ১৯৫০ সালের একেবারে শেষ দিকে এবং ছেড়ে আসেন ১৯৫১ সালে। সেই সময়ে তাঁর উপলব্ধি: "গণনাট্য সংঘ আমাকে জনতার মুখরিত সখ্যে নিয়ে গেল। একটা ঘুম ভেঙে গেল"। উদ্ধৃত, নৃপেন্দ্র সাহা, *বাংলার রাজনৈতিক থিয়েটারে উৎপল দত্ত*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৫

১৯. "গণনাট্য সংঘে থাকতে পারলাম না। ... গণনাট্য সংঘ যে আদর্শে আমাদের উদ্বুদ্ধ করেছিল সে আদর্শকে আঁকড়ে ধরার বাসনা আমাদের প্রায় সবাইকে পেয়ে বসেছিল। মিটিং করে স্থির করা হলো লিটল থিয়েটার গ্রুপ সম্পূর্ণত বাংলা নাটকে মনোনিবেশ করবে।" উদ্ধৃত, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৬

২০. *ফেরারী ফৌজ* নাটকের প্রথম অভিনয়ের তারিখ 'নাটক সমগ্র'-তে দেয়া আছে ১৯৬৯ সালের ২৮ মে। কিন্তু মন্মথ রায়ের লেখা নাটকটির ভূমিকা থেকে জানা যায় এটি ১৯৬১ সালে রচিত এবং ঐ বছরই ২৮ মে তারিখে 'লিটল থিয়েটার গ্রুপ' কর্তৃক প্রথম অভিনীত। নৃপেন্দ্র সিংহ তাঁর *বাংলার রাজনৈতিক থিয়েটারে উৎপল দত্ত* গ্রন্থে দ্বিতীয় তারিখটিকে যথার্থ বিবেচনা করেছেন (পৃ. ১১৯)। *ফেরারী ফৌজ* নাটকের রচনা এবং প্রথম মঞ্চায়নের এই তারিখটি যথার্থ।

২১. "ফেরারী ফৌজ নামটি সাহিত্যের দিগ্‌দর্শক প্রেমেন্দ্র মিত্রের দেয়া। তাঁর বিখ্যাত কবিতার নাম এ নাটকে যুক্ত করতে আদেশ দিয়ে আমাকে ধন্য করেছেন।"—উৎপল দত্ত, *ফেরারী ফৌজ*, নাট্যকারের কথা, *নাটক সমগ্র*, পৃ. ১৪৮

২২. উৎপল দত্ত, ফেরারী ফৌজ, নাট্যকারের কথা, *নাটক সমগ্র*, পৃ. ১৪৮

২৩. রাইফেল, *নাটক সমগ্র*, পৃ. ২৭৯

২৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৯

২৫. সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, *উৎপল দত্ত ও তাঁর থিয়েটার*, কলকাতা, ১৯৯৬, প্যাপিরাস, পৃ. ৩১

২৬. *Towards A Revolutionary Theatre*, ibid, p. 57

২৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮০

২৮. ফেরারী ফৌজ, *নাটক সমগ্র*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৫১

২৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫২

৩০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৮

৩১. রাইফেল, *নাটক সমগ্র*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩০২

৩২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০২

৩৩. ফেরারী ফৌজ, *নাটক সমগ্র*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৭৫

৩৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭০

৩৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৪-১৬৫

৩৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ২১২

৩৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৮

৩৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৩-২১৪

৩৯. রাইফেল, *নাটক সমগ্র*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৯৮

৪০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯০

৪১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৩-৩২৪

৪২. পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৮

৪৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৮

৪৪. ভারতে সশস্ত্র-বিপ্লব সম্পর্কে যে সকল গ্রন্থে তথ্য পাওয়া যায় সেগুলোর মধ্যে *ভারতের সশস্ত্র-বিপ্লব*, ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়; *আত্মকথা*, বারীন ঘোষ, *বাঙলায় বিপ্লবপ্রচেষ্টা*, হেমচন্দ্র কাননগো; *বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি*, যদুগোপাল মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি গ্রন্থের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

৪৫. ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়, *ভারতে সশস্ত্র-বিপ্লব*, কলিকাতা, ১৩৭৭, রবীন্দ্র লাইব্রেরী, পৃ. ১৪৭

৪৬. ফেরারী ফৌজ, *নাটক সমগ্র*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২১৪

৪৭. রাইফেল, *নাটক সমগ্র*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩৫০

৪৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৩

৪৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৩

৫০. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৭

৫১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩০ ও ২৮৫

৫২. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৪

৫৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৩-৯৪

৫৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫১